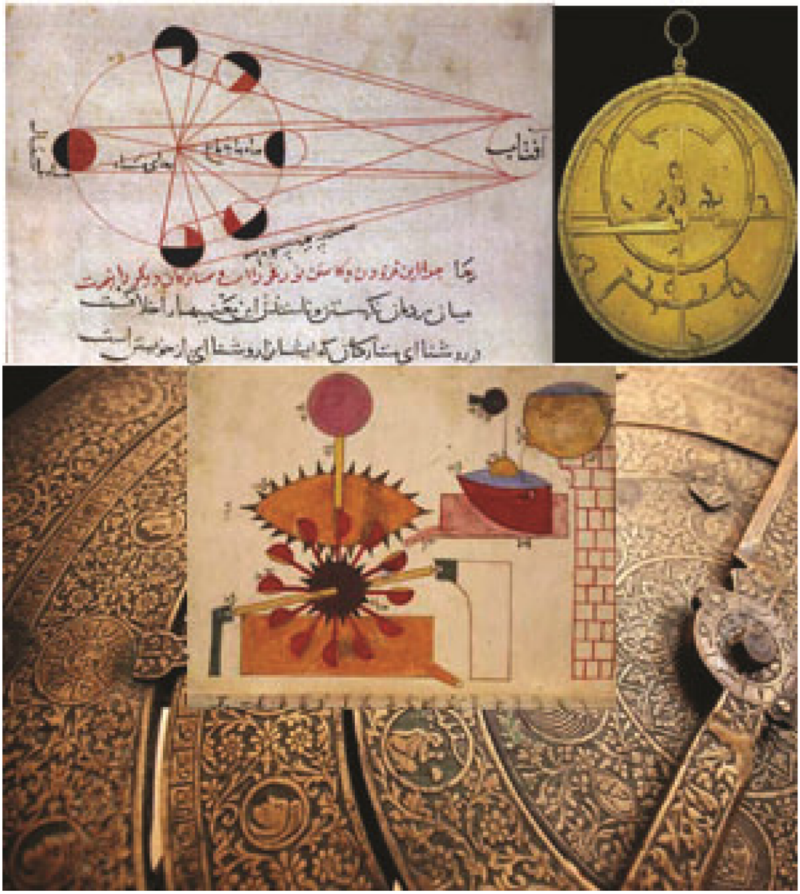
ইসলাম ও বিজ্ঞান
তৃতীয় খণ্ড

দ্বীন ও বিজ্ঞান



ইসলাম ও বিজ্ঞান (৩ খণ্ডে সমাপ্ত)

বিশেষ ইন্টারনেট সংস্করণ

রচনা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

গবেষণা বিভাগ

খানকায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার, সিলেট, বাংলাদেশ।

ইসলাম ও বিজ্ঞান

তৃতীয় খণ্ড

রচনা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

ইন্টারনেট সংস্করণ

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
গবেষণা বিভাগ
আলী সেন্টার, সিলেট, বাংলাদেশ।
engineerazizulbari@gmail.com

সূচিপাতা

"আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন; এদের কতক পেটে ভর দিয়ে চলে, কতক দু'পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে। আল্লাহ যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান" [সূরা নূর: ৪৫]।

তৃতীয় খণ্ড : দ্বীন ও বিজ্ঞান

ভূমিকা

গ্রন্থের শেষ এই খণ্ডে আমরা দ্বীন ইসলামের আলোকে বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণামূলক আলেচানা করবো। পাঠকরা সর্বক্ষেত্রে আমার সঙ্গে একমত হবেন তা আমি মনে করি না। তবে বিজ্ঞান যে ইসলামের সঙ্গে কোন সংঘাত সৃষ্টি অতীতেও করে নি এবং এখন কিংবা ভবিষ্যতেও করবে না এ সত্যটি উপলব্ধি করার জন্যই আমি আমার ব্যক্তিগত গবেষণা পাঠকদের সকাশে উপস্থাপন করেছি।

এই গবেষণা যেহেতু একান্তই আমার নিজস্ব, তাই এতে ভুল-ত্রুটি বেশি থাকা স্বাভাবিক। বিশেষকরে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন আয়াতমালার কিছু নতুন ব্যাখ্যা এসেছে যা অতীতে বড় বড় জ্ঞানবানদের ব্যাখ্যা বা তাফসীর থেকে ভিন্ন। তবে আমার এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলো তাফসীর হিসেবে গ্রহণ করার জন্য কাউকে বলবো না। বিজ্ঞানের উপর যেসব আয়াতমালা আছে এগুলোর ব্যাখ্যা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে তুলে ধরেছি মাত্র। এর মাধ্যমে অতীতের তাফসীরবিদদের ব্যাখ্যা বাতিল কিংবা রহিত হয়ে মোটেই যায় নি। তাঁদের ব্যাখ্যা যেমন সঠিক তেমনি আমারটাও বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পাঠকরা অনুগ্রহ করে, এই **'সম্ভাবনা'** কথাটি মনে রেখে কুরআনের আয়াতমালার ব্যাখ্যা যেসব ক্ষেত্রে এসেছে তা পাঠ ও অনুধাবন করবেন। এছাড়া এটা মনে রাখতে হবে, পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা একাধিক হতে পারে। বরং এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, কুরআনের একেকটি আয়াতের ৭টি পর্যন্ত অর্থ আছে। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দুটি অর্থ যে আছে, সেকথা প্রায় সবাই বলে থাকেন।

সুতরাং শেষ এই খণ্ডটি পাঠের সময় আমি আশা করবো পাঠকরা উপরোক্ত বিষয়বস্তু স্মরণ রেখে অগ্রসর হবেন। আমি ক্ষুদ্রজ্ঞানী এক সাধারণ লোকের পক্ষে এমন উচ্চতর গবেষণার ইচ্ছাপোষণই মূলতঃ দুঃসাহস বৈ কিছু নয়। কিন্তু আজকের বিজ্ঞানমনা মানুষের মনে কিছু ভুল ধারণার জন্ম নিয়েছে বিধায় এ কাজে আল্লাহর নামে হাত দেওয়া একান্ত জরুরী মনে করেই সাহস করেছি। আমি আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং এই গবেষণায় তাঁর একান্ত সাহায্য কামনা করছি।

"তিনি মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু নিজ অনুগ্রহে তোমাদের অধীন করেছেন; এতে রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন" [সূরা জ্বা-ছিয়াঃ ১৩]।

পরিচ্ছেদ ১

ইসলাম, জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মানবেতিহাসে এমন কোন তুলনামূলক কাল অতিবাহিত হয় নি, যে হারে আজকের যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্রুত সম্প্রসারণ হচ্ছে। এ গতি নতুন এ (একবিংশ) শতাব্দিতে আরও দ্রুততর হবে, একথা নিশ্চিত। আজকের মানুষ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জ্ঞানের পরিধি বর্ধনে যেভাবে যৌথ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তার নজির গত পাঁচ হাজার সালের লিখিত ইতিহাসে অত্যন্ত বিরল। জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিতে মানুষ অগ্রসর হচ্ছে। পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বড় বড় ইন্সটিটিউট, গবেষণাকেন্দ্র। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতির ফলে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার মাধ্যমে আজ ঘরে ঘরে জ্ঞানের আলো পৌঁছেছে। কম্পিউটার আর ইনটারনেটের মাধ্যমে পাঁচ বছরের শিশুরাও আজ যে জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হচ্ছে, তা মাত্র দু'দশক পূর্বেও অসম্ভব বলে ধারণা করা হতো। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আধুনিক বিজ্ঞানের স্বরূপ নিয়ে কিছুটা দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। তবে এই জ্ঞান আহরণ কি আমরা মুসলমানদের জন্য জরুরী?

এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব হলো, বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানার্জন ও এ থেকে উপকার সাধন ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই এবং মুসলমান হিসেবে এই জ্ঞান অর্জন করা শুধু নিরাপদ নয় বরং একান্ত কাম্য। বিজ্ঞানের এ ব্যাপক সম্প্রসারণ থেকে যে কেউ এটা আহরণ করা থেকে বঞ্চিত হবে, সে নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্তের সম্মুখীন হবে। জ্ঞানই ক্ষমতা বা নলেজ ইজ পাওয়ার- এ প্রবাদ বাক্যের বাস্তবতা আজ যেন সূর্যের অস্তিত্বের মত সত্য হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। যার কাছে জ্ঞান-বিজ্ঞান বেশী সে-ই এ পৃথিবীতে কর্তৃত্ব অর্জন করেছে। কারো পছন্দ হোক বা না, এটাই বাস্তবতা। কিন্তু আসল ব্যাপার হলো এ জ্ঞান-বিজ্ঞান আজ আর কারো ব্যক্তিগত

সম্পদ নয় বা গুপ্ত-জ্ঞানও নয় যে, কারো পক্ষে তা আহরণ করা কঠিন হবে। আজকাল এমন কিছু সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে; ফলে যে কোন লোক প্রায় বিনামূল্যে যে কোন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির মৌলিক উৎস হচ্ছে কুরআন শরীফ

এটা ধীরে ধীরে মুসলিম ও এমনকি অমুসলিমদের কাছে পরিষ্কার হয়ে আসছে যে, ইসলামের মহান ঐশিগ্রন্থ আল-কুরআনই অধুনিক বিজ্ঞানের মৌলিক উৎস। এ মহাসত্য ইউরোপীয় রেনেসাঁর পর থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত ইতিহাসের আঁধার-কক্ষে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিলো। যারা এ সত্যকে দাবিয়ে রেখেছিলেন তারাই আবার এটা বাধ্য হয়ে প্রকাশ করছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, বিগত আট শতাব্দি যাবৎ মুসলিম সভ্যতার ক্রমাগত অবনতি হওয়ায় ও মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞানপিপাসার অধঃপতনের ফলে এ সত্য তাদের মনন, মস্তিষ্ক ও ইতিহাস থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। পশ্চিমা বিজ্ঞানমুখী সভ্যতার ক্রমাগত উৎকর্ষ মুসলমানদের আপন জ্ঞান-পিপাসু অতীতকে পর্যন্ত বিস্মিত করে দেয়। অবশ্য এর জন্য উইরোপীয় ও পরবর্তীতে আমেরিকান অপপ্রচার, ষড়যন্ত্র প্রভৃতিও বহুমাত্রায় দায়ী ছিলো। যেখানে ইউরোপ মুসলিম সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে চতুর্দশ শতক থেকে সাদরে গ্রহণ করে পৃথিবীর বুকে নবতর বিপ্লব সৃষ্টি করলো, অথচ তখনকার পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ যারা সেই জ্ঞানের উত্তরসূরী ছিলো, তারা এ অগ্রগতি থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। বিগত মিলেনিয়াম বা সহস্র বছরের ইতিহাসে এ অকৃতকার্যতাই আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা হৃদয়-বিদারক ব্যাপার। এটা প্রকাশ করতে দ্বিধা নেই যে, এ ফেইলারের কথা সচেতন মুসলমানদেরকে সময় সময় বেশ আপ্লুত ও আহত করে ফেলে। চলন্ত মিলেনিয়াম যেন মুসলমানদের জন্য এরূপ না হয়, এ কামনা, এ বাসনা আমাদের মনে সদা-জাগ্রত হয়ে আছে। আল্লাহর দরবারে তাই আকুল আবেদন করি, তিনি যেন আমাদের জ্ঞান-চক্ষু এখনই খুলে দেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানরা একবিংশ শতকের শুরুতেই অগ্রণী হয়ে যায়।

পবিত্র কুরআনে প্রায় আটশত আয়াত আছে যেগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত। এসব আয়াতমালা দেড় হাজার বছর পূর্বে যখন নাজিল হয়েছিলো, তখন মানুষ এগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পান নি। তবে এসব মহাসত্যের আয়াতমালা তখন নাজিল হওয়ায় কিন্তু বিফলে যায় নি। আল্লাহর দেওয়া এসব জ্ঞান-বাক্যগুলোর অনুকরণেই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের কিছুদিন পর থেকেই প্রায় সাত শতাব্দি যাবৎ শত শত মুসলিম বিজ্ঞানী, গবেষক, দার্শনিক ও জ্ঞান-সাধকদের আবির্ভাব শুরু হয়। এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আমরা দেখেছি তাঁরা অতীতে আবিষ্কৃত গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা, তাঁদের লেখার অনুবাদ ও নিজেরা গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, মেডিক্যাল বিজ্ঞানসহ কয়েকটি নতুন শাখার জন্ম কিভাবে দিয়েছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ ব্যাপক প্রসার ইসলামিক বিশ্ব ও এর চতুর্সীমানায় দ্রুত বিস্তৃত হয়। এটা ইতিহাসের বাস্তবতাসহকারে প্রমাণসহ বলা যায় যে, পবিত্র কুরআন শরীফ থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ অগ্রগতি হয়েছিলো। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দির ইউরোপীয় রেনেসাঁ ছিলো এ অগ্রগতির সরাসরি ফসল।

কুরআন ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অমুসলিম গবেষকদের উক্তি

সম্পূর্ণ কুরআন শরীফই যে ওহীর জ্ঞান, এটা মানবতার প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত মৌলিক জ্ঞানের উৎস এবং এ মহাগ্রন্থের প্রাপক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই যে মানবেতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানবান মহাপুরুষ ছিলেন- তার কয়েকটি বাস্তব প্রমাণ এবার পাঠকদের সম্মুখে তুলে ধরছি। মুসলমান হিসেবে ভাবের আবেগ ও আপন ধর্মের সুবাদ প্রকাশে উপরোল্লিখিত কথাগুলো আমি বলেছি, এ ধারণা অনেকের মনে জন্ম নিতে পারে। আর এটা অস্বাভাবিকও নয়। তাই এখন পশ্চিমা পণ্ডিত ও অ-মুসলিমরা কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কি বলছেন তা তুলে ধরছি। আগেই বলে রাখি এসব চিন্তাশীল মনীষীরা পূর্ব-প্রাচ্যে সর্বত্র বড় ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ বলে সর্বজন-স্বীকৃত।

(ক)

"Leaders must fulfil three functions; provide well-being of the led, provide social organisation in which people feel relatively secure, and provide them with one set of beliefs. People like Pasteur are leaders in the first sense. People like Gandhi and Confichyus, on one hand, and Alexander, Caesar, and Hitler on the other, are leaders in the second and perhaps third sense. Jesus and Buddha belong to third category alone. Perhaps the greatest leader of all times was Muhammad (ASW), who combined all three functions. To a lesser degree Moses did the same."

-Jules Masserman, Jewish, Psychoanalysis Professor at the University of Chicago; quoted in Time, July 15, 1974

ভাবার্থ: "নেতাদের পক্ষে তিনটি বিষয় পূর্ণ করা আবশ্যক; অনুরাসীদের সুখ-শান্তির নিশ্চয়তা দান, সামাজিক নিরাপত্তা দান- যেখানে মানুষ নিরাপদে বাস করতে পারে এবং তাদেরকে (অনুসারীদেরকে) একগুচ্ছ জীবনদর্শন (বিশ্বাস) দান করা। পাসটিউ (ফরাসী দার্শনিক) হচ্ছেন এমন একজন নেতা যাকে প্রথম শর্তানুযায়ী নেতা বলা চলে। একদিকে গান্ধি, কনফিউসিয়াস আর অপরদিকে আলেকজান্ড্রার, সিজার ও হিটলারকে দ্বিতীয় এবং হয়তো বা তৃতীয় শর্তানুযায়ী নেতা বলা যায়। ঈসা (আলাইহিস্‌সালম) এবং বৌদ্ধ হচ্ছেন তৃতীয় শর্তের নেতা। তবে সর্বকালের সর্বপ্রধান নেতা ছিলেন হয়ত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), যিনি তিনটি শর্তই পূর্ণ করে গিয়েছেন। এর থেকে কিছুটা নিম্নমানের পর্যায়ে মূসাও (আলাইহিস্‌সালাস) তা করেন।"

(খ)

Shepherd people of Thomas Carlyle (1840's):
"A poor shepherd people, roaming unnoticed in its deserts since the creation of the world: a hero-prophet was sent down to them with a word they could believe: See, the unnoticed becomes world-notable, the small has grown world-great; within one century afterwards, Arabia is at Grenada, Spain on this hand, at Delhi, India on that; -Glancing in valour and splendour and the light of genius, Arabia shines through long ages over a great section of the world. Belief is Great, life-giving. The history of a nation becomes fruitful, soul elevating, great, as soon as it believes. These Arabs, the Man Muhammed (ASW), and that one century; -Is it not as if a spark had fallen, one spark, on a world of what seemed black unnoticeable sand; but LO!, the sand proves explosive powder, blazes heaven high from Delhi to Grenada I said, the Great Man was always as lightning out of heaven; the rest of men waited for him like fuel, and then they too would flame."

ভাবার্থ: থমাস কার্লাইল "মেষপালক জনগোষ্ঠী (১৮৪০)"-তে বলেন: "জগত সৃষ্টির সূচনা থেকে একদল নিঃস্ব অজানা-অচেনা মেষপালক, মরুর বুকে যাযাবর জীবন কাটাতো: এক মহানায়ক-বার্তাবাহক তাদের কছে পাঠানো হলো একটি বাণী সহকারে, যা তারা বিশ্বাস করতে পারে: দেখো, অজানা হলো বিশ্বব্যাপী জানা, ক্ষুদ্র বেড়ে হলো পৃথিবী-বৃহৎ; মাত্র একটি শতকের পরে আরবরা এলো গ্রেনাডা (স্পেন), স্পেন এক হস্তে, দিল্লীতে, ভারত তার ওপর হাতে;- বীরত্বের ক্ষণিক-প্রভা নিয়ে দীপ্তিময় এবং আলোর প্রতিভাসহ। আরাবিয়া করে ঝলঝল পৃথিবীর বৃহত্তর ভাগে যুগ-যুগান্তর ধরে। ঈমান মহান, জীবন-দাতা। একটি জাতির ইতিহাস হলো সাফল্যমণ্ডিত। এসব আরব, মহাপুরুষ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম), এবং ঐ [ইতিহাসের] এক-শতক:- এটা নয় যে, একটি স্ফুলিঙ্গ নেমে এসেছে, একটি জগতে যা মনে হচ্ছিল অবহেলিত কৃষ্ণ-বালুকা; কিন্তু ওয়াও! বালুকা হলো বিস্ফোরনোম্মুখ ধূলিকণা, আকাশ-পাতাল অগ্নিশিখা দিল্লী থেকে গ্রেনাডা, আমি বলেছি, এ মহান ব্যক্তি ছিলেন সদা, যেন আকাশ থেকে আগত বিজলীবাতি; বাকি সব মানুষ তাঁরই জন্য অপেক্ষায় ছিলো যেন ইন্ধন, এবং তারাও শেষে জ্বলন্ত হলো।”

(গ)

"The Creed of Muhammad (ASW) is free from the suspicions of ambiguity and the Qur'an is Glorious testimony to the Oneness of God."
-by Gibbon in his "Decline and Fall of the Roman Empire."

ভাবার্থ: “মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বীন হলো দ্ব্যর্থহীন এবং কুরআন হচ্ছে আল্লাহর একত্বের গৌরবোজ্জ্বল সাক্ষী।” (গিবন, “ডিক্লাইন এন্ড ফল অব রোমান এম্পায়ার।”)

(ঘ)

"If a man like Muhammad (ASW) were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problems that would bring it the much needed peace and happiness"
-George Bernard Show

ভাবার্থ: “আজকের বিশ্বে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এঁর মতো যদি কেউ নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন, তবে তিনি বিশ্বের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হতেন এবং এর ফলে অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জিত হতো।” (জর্জ বার্নাড শো)

(ঙ)

"Well then, if the Koran were his own composition other man could rival it. Let them produce ten verses like it. If they could not (and it is obvious that they could not), then let them accept the Koran as an outstanding evidential miracle."

-H.A.R. Gibb, Muhammedanism, London 1953, p. 33.

ভাবার্থঃ "ভালোকথা, কুরআন যদি তাঁর (হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) নিজস্ব রচনা হতো তবে অন্য কোন মানুষ প্রতিযোগিতা করতে পারত। তাদেরকে কুরআনের মত দশটি আয়াত রচনা করতে বলো। যদি তারা পারে না (এবং এটা সহজে বুঝা যায় যে তারা পারে নি), তাহলে তাদেরকে, কুরআনকে একটি অত্যাশ্চর্য অলৌকিক প্রমাণস্বরূপ বলে গ্রহণ করে নিতে দাও।" (এইচ.এ.আর. গিব, মুহামেডানিজম, লন্ডন ১৯৫৩, পৃঃ ৩৩।)

(চ)

"There is no other Book exists in the World where, its language has not changed after as long as thirteen centuries have elapsed."

-Sir William Muir, Life of Mohammed, London

ভাবার্থঃ "এ জগতে অন্য কোন গ্রন্থ (আল-কুরআনের মত) নেই যে, তেরশ বছর পার হয়ে গেছে, আর এতো দীর্ঘকাল পরও তার ভাষা বদলে যায় নি।" -স্যার উইলিয়াম মুইর, লাইফ অব মুহাম্মেদ, লন্ডন।

(ছ)

"Four years after the death of Justinian, A.D. 569, was born at Mecca, in Arabia the man who, of all men exercised the

greatest influence upon the human race. . .Muhammad (ASW). . ."
-John William Draper, M.D., LL.D., A History of the Intellectual Development of Europe, London 1875, Vol 1, pp329-330

ভাবার্থঃ "জাসটিনিয়ান-এর মৃত্যুর চার বছর পর, ৫৬৯ [মতান্তরে] খস্টাব্দে, যে পুরুষ আরবের মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যিনি সব মানুষের মধ্যে সর্বপেক্ষা বৃহত্তর প্রভাব বিস্তার করেন সমগ্র মানবজাতির উপর... [তিনি হচ্ছেন] মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)...।" -জন উইলিয়াম ড্রেপার, এম.ডি., এলএল.ডি., এ হিস্টোরী অব দ্যা ইন্টেলেকচ্যুয়াল ডেভেলাপমেন্ট অব ইউরোপ, লন্ডন ১৮৭৫, খণ্ড ১, পৃঃ ৩২৯-৩৩০।

(জ)
"So there has been no opportunity for any forgery or pious fraud in the Koran, which distinguishes it from almost all other important religious works of ancient times. . .It is exceedingly strange that this illeterate person should have composed the best book in the language."
-Basanta Kumar Bose, Mohammedanism, Calcutta 1931, p.4.

ভাবার্থঃ সুতরাং কুরআনে কোনো প্রতারণা বা নকল করার সুযোগ আসে নি, যা অন্যান্য পুরাতন প্রায় সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থের মধ্যে এটাকে একক অবস্থানে রেখেছে... ... এটা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক যে, এই নিরক্ষর (নবী- সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোক, ভাষার (আরবীর) মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম পুস্তক রচনা করতে পারেন।" -বসন্ত কুমার বসু, মুহামেডানিজম, কলকাতা, ১৯৩১, পৃঃ ৪।

(ঝ)
"How could a man (Muhammad [ASW]) being illeterate, become the most important author, in terms of literary merits, in the whole of Arabic literature? How could he then pronounce truths of a scientific nature that no other human-being could possibly have developed at that time, and all this without once making the slightest error in his pronouncement on the subject?"
-Dr. Maurice Bucaille

ভাবার্থ: "একজন লোক (মুহাম্মদ- সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিরক্ষর হয়ে কি করে আরবী সাহিত্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ লেখক হতে পারেন? কি করে তিনি বিজ্ঞানের সত্য তথ্যে পরিপূর্ণ বিষয় লিখতে পারেন যা, তাঁর সময়ের মানব-সমাজ সেসব ব্যাপারে কিছুই জানার কোন সম্ভাবনাই ছিলো না, এবং এ সবকিছুই লেখা হয়েছে একটিবারও ভুল ছাড়া; এ বিষয়কে (বিজ্ঞানের তথ্যাবলী) ব্যক্ত করতে?" -ড. মরিস বুকাইলি।

(ঞ)
"If greatness of purpose, smallness of means, and astounding results are the three criteria of human genius, who could dare to compare any great man in modern history with Muhammad (ASW)? The most famous man created arms, laws and empires only. They founded, if anything at all, no more than material powers which often crumbled away before their eyes. This man moved not only armies, legislation, empires, peoples and dynasties, but millions of men in one-third of the then inhabited world; and more than that, he moved the altars, the gods, the religions, the ideas, the beliefs and souls...his forbearance

in victory, his ambition, which was entirely devoted to one idea and in no manner striving for an empire; his endless prayers, his mystic conversations with God, his death and his triumph after his death; all these attest not to an imposture but to a firm conviction which gave him the power to restore a dogma. This dogma was twofold, the unity of God and immateriality of God; the former telling what God is, the latter telling what God is not; the one overthrowing false gods with the sword, the other starting an idea with words."
-Lamartine, Historie de la Turquie, Paris 1854, Vol II, pp. 276-277.

ভাবার্থ: "যদি কার্যের মহত্ত্ব, সামর্থের অভাব ও আশ্চর্য ধরনের ফলাফল অর্জনই হয় মানব-মাহাত্ম্য বিচারের উপায়, তবে এ পর্যন্ত আধুনিক ইতিহাসে এমন মহৎ ব্যক্তিত্ব কে আছেন যে, মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে তুলনা করা যায়? সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা অস্ত্র, আইন ও সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেছেন মাত্র। তারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যদি ঠিক করেই থাকেন, বৈষয়িক ক্ষমতা, যা অনেক ক্ষেত্রে তাদেরই চোখের সম্মুখে আবার ধ্বংস হয়ে গেছে। এ ব্যক্তি (মুহাম্মদ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুধু সৈন্যদেরকে নিয়ন্ত্রিত করেন নি, আইন, সাম্রাজ্য, মানুষ এবং খিলাফতসমূহ-সহ, তাঁর সময়ের কোটি কোটি মানুষ; পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যাকেও নিয়ন্ত্রণ করেছেন; এবং আরও তাঁর দ্বারা ধ্বংস হয়েছে- দেবদেবী, কৃত্রিম খোদাসমূহ, আগেকার ধর্মগুলো, আগের ধারণাসমূহ, বিশ্বাস ও আত্মা (মানুষের আত্মিক পরিশুদ্ধি)... তাঁর সহিষ্ণুতা জয়ের মধ্যে, তাঁর উচ্চাভিলাষ, যা একমাত্র একটি বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ এবং তা সাম্রাজ্য সৃষ্টির জন্য নয়; সেটা তাঁর অশেষ এবাদত, তাঁর গুপ্ত কথোপকথন আল্লাহর সাথে, তাঁর মৃত্যু এবং অতঃপর তাঁর সাফল্য; এ সবকিছু প্রমাণ করে এটা কোন ভণ্ডামী নয়, বরং একটি বলিষ্ঠ উদ্দেশ্য সমাধানের আকাঙ্ক্ষা যা তাঁকে শক্তি যোগিয়েছে একটি সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। এ সত্য ছিলো দু'ধরনের;

আল্লাহর একত্ব ও আল্লাহ কোনো বস্তু নন; প্রথমটি বলে যা আল্লাহ হন, আর দ্বিতীয়টি বলে যা আল্লাহ নন; একটি কৃত্রিম খোদাকে অসির মাধ্যমে উৎখাত করে, আর অপরটি একটি ধারণা জন্মায় শব্দের (কালাম) মাধ্যমে।" -লামারটিন, হিস্টোরী দি লা তুর্কী, প্যারিস ১৮৫৪, খণ্ড ২, পৃঃ ২৭৬-২৭৭।

(ট)

"... A Book which is a Poem, a Code of Laws, A Book of Common Prayer and Bible all in one; and is reverenced to this day by a sixth of the whole human race as a miracle of purity, of style, of wisdom and of truth. It is the one miracle claimed by Mohammed (ASW), his standing miracle, he called it and a miracle indeed it is."

"He is Caesar and Pope in one; but he was Pope without Pope's pretentions, Caesar without the legions of Caesar: without a standing army, without a bodyguard, without a palace, without a fixed revenue; if ever any man had the right to say that he ruled by the right divine, it was Muhammad (ASW), for he had all the power without its instruments and without its supports."
-Rev. R. Bosworth Smith, Mohammad and Mohammadanism, London 1874, p 92

ভাবার্থঃ "... একটি গ্রন্থ যা একটি কবিতা, একটি আইনশাস্ত্র, একটি সাধারণ উপাসনার বই এবং একটি বাইবেল- সব একত্রে; এবং আজ পর্যন্ত এটা পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ [এখন এক তৃতীয়াংশের অধিক] মানুষের শ্রদ্ধার বিষয়, একটি পবিত্র অলৌকিক ব্যাপার, ধারা, জ্ঞান ও মহাসত্য। এটাই একটি অলৌকিক জিনিস যা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাবী করেছেন, তাঁর চিরন্তন মু'যিজা- তিনি বলেছেন, এবং অবশ্যই এটি একটি মু'যিজা।"

"তিনি কায়সার এবং পোপ একই সাথে; কিন্তু তিনি পোপ ছিলেন পোপের দাবি ছাড়া, তিনি কায়সার ছিলেন কায়সারের সৈন্য-সামন্ত ছাড়া, প্রাসাদ ছাড়া, স্থিরীকৃত কোন আয় ছাড়া; যদি কখনো কোন মানুষের পক্ষে একথা বলার দাবি থেকে থাকে যে, শাসন করার ক্ষমতা তাঁর খোদায়ী প্রত্যাদেশ তবে সে মানব ছিলেন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), কারণ, তাঁর ছিলো সর্ব-ক্ষমতা, এর (ক্ষমতার্জনের সচরাচর) উপকরণসমূহ ও সহযোগিতা ছাড়াই।"
-রেভারেন্ড (পাদ্রী) আর. বসওয়ার্থ স্মিথ, মুহাম্মাদ এন্ড মুহামেডানিজম, লন্ডন ১৮৭৪, পৃঃ ৯২।

(ঠ)
"In making the present attempt to improve on the performance of my predecessors, and to produce something which might be accepted as echoing however faintly the sublime rhetoric of the Arabic Koran, I have been at pain to study the intricate and richly varied rhythms which -apart from the message itself- constitute the Koran's undeniable claim to rank amongst the greatest literary masterpieces of mankind."
-Arthur J. Arbery, The Koran Interpreted, London: Oxford University Press, 1964, p. X.

ভাবার্থ: "আমার পূর্ববর্তীদের কার্যের উন্নতি সাধনের বর্তমান এ প্রচেষ্টা এবং এমন একটি বস্তু (লেখা) প্রকাশ করার ইচ্ছা যা, সামান্য হলেও গ্রহণযোগ্য হবে আরাবী কুরআনের, ভক্তিমূলক বক্তব্যের ভাব, আমি অত্যন্ত কষ্টে এর (কুরআনের) বিজড়িত ও প্রচুর ছন্দের সৌন্দর্য অধ্যয়ন করেছি যা- এর আসল বাণী ছাড়াও - কুরআনের সঠিক অনস্বীকার্য দাবী হলো, এটা মানবজাতির একটি সর্ব-প্রধান সাহিত্যকর্ম।" -আর্থার জে. আরবেরী, দ্যা কুরআন ইন্টারপ্রিটেড, লন্ডন: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৪, পৃঃ ১০।

(ড)

"Philosopher, orator, apostle, legislator, warrior, conqueror of ideas, restorer of rational dogmas, of a cult without images; the founder of twenty terrestrial empires, that is Muhammad (ASW). As regards all standards by which human greatness may be measured, we may well ask, is there any man greater than he?"

-Lamartine, "Historie de la Turquie", Paris 1854, Vol II, pp. 276-277

ভাবার্থঃ "দার্শনিক, বক্তা, পয়গম্বর, আইন-প্রণেতা, যোদ্ধা, ভাবের বিজেতা, যুক্তিবাদী ধর্মমতের প্রত্যর্পণদাতা, একটি দেবতাহীন ধর্ম-পদ্ধতি; ২০টি পার্থিব সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি হন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। যতো মাপেই মানব-মাহাত্ম্য বিবেচনা করা হোক না কেন, আমরা হয়ত জিজ্ঞেস করতে পারি, কোনো মানুষ কি আছে তাঁর থেকে আরোও মহান?" -লামারটিন, হিস্টোরী দি লা তুর্কী, প্যারিস ১৮৫৪, খণ্ড ২, পৃঃ ২৭৬-২৭৭।

(ঢ)

"A totally objective examination of it (The Qur'an) in the light of modern knowledge, leads us to recognise the agreement between the two, as has been already noted on repeated occasions. It makes us deem it quite unthinkable for a man of Muhammad's (ASW) time to have been the author of such statements on account of the state of the knowledge in his day."

-Dr. Maurice Bucaille, "The Qur'an and the Modern Science", 1981, p.18.

ভাবার্থ: "নতুন জ্ঞানের আলোকে এটাকে (আল কুরআন) শুধুমাত্র বস্তুগতভাবে বিবেচনা করলেই আমরা ধরতে পারি যে, কুরআন ও আধুনিক জ্ঞানের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান যা ইতোমধ্যে অনেক জায়গায়ই বর্ণিত হয়েছে। এটা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সময়ে এরূপ জ্ঞান মানুষের জানা ছিল, যা থেকে তিনি এসব অত্যাধুনিক তথ্য নিজে লিখতে পারেন।" -ড. মরিস বুকাইলি, দ্যা কুরআন এন্ড দ্যা মডার্ণ সাইন্স, ১৯৮১, পৃ: ১৮।

(ণ)

"It is impossible for anyone who studies the life and character of the great Prophet of Arabia, who knows how he taught and how he lived, to feel anything but reverence for that mighty Prophet, one of the great messengers of the Supreme."
-Annie Besant, "The Life and Teachings of Muhammad", Madras, 1932, p.4

ভাবার্থ: "আরবের মহান নবীর জীবন ও চরিত্র যারা অধ্যয়ন করেন, যারা জানেন তিনি কিভাবে থাকতেন ও কিভাবে শিক্ষা দিতেন, তাদের জন্য এ মহান শক্তিশালী নবীর ব্যাপারে একমাত্র শ্রদ্ধা ছাড়া আর কিছু অনুভব করা অসম্ভব, তিনি হচ্ছেন মহা-প্রতাপশালীর (আল্লাহর) একজন মহান পয়গম্বর।" -আনী বেসেন্ট, দ্যা লাইফ এন্ড টিচিংস অব মুহাম্মাদ, মাদ্রাজ, ১৯৩২, পৃ: ৪।

(ত)

"Here, therefore, its merits as a literary production should perhaps not be measured by some preconceived maxims of subjective and aesthetic taste, but by the effects which it produced in Muhammad's (ASW) contemporaries and fellow countrymen. If it spoke so powerfully and

convincingly to the hearts of his hearers as to weld hitherto centrifugal and antagonistic elements into one compact and well organised body, animated by ideas far beyond those which had until now ruled the Arabian mind, then its eloquence was perfect, simply because it created a civilised nation out of savage tribes, and shot a fresh woof into the old warp of history."
-Steingass, quoted in Hughes' Dictionary of Islam, p.528

ভাবার্থ: "অতএব, এখানে, এটার (কুরআনের) মূল্য, একটি সাহিত্যকর্ম হিসেবে পূর্ব-ধারণাকৃত কোন বিষয়ভিত্তিক এবং রসসমৃদ্ধ সৌন্দর্যবিজ্ঞানের সূত্র হতে এটা উদ্বুদ্ধ হয়ত বিবেচনা করা উচিৎ নয়, তবে মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমসাময়িকদের ও তাঁর দেশের মানুষের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া বিচার্য। এ গ্রন্থ যদি কথা বলে থাকে শক্তিশালী ও নিঃসন্দেহভাবে তার শ্রোতাদের হৃদয়ে যার ফলে, অদ্যাবধি জড়িত হয়ে যায় অপকেন্দ্রিক এবং বিরোধী উপাদানসমূহ একটি দৃঢ় ও শক্তিশালী সংঘে, এমন একটি ধারণা দ্বারা চালিত যা ছিলো ইতোপূর্বে শাসিত আরব মনন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহলে এটার (কুরআনের) বাগ্মিতা ছিলো পূর্ণাঙ্গ, এর কারণ কেবল, এটা একটি বর্বর গোত্রগুলো থেকে জন্ম দিয়েছে সভ্যতা এবং পুরাতন ইতিহাসের পাতায় রাঙ্গানো হয়েছে নতুন লক্ষ্যবস্তু।" -স্টিগনেস, হিউজ প্রণীত 'ডিকশনারী অব ইসলাম' -এ উদ্ধৃত, পৃঃ ৫২৮।

(থ)
"My choice of Muhammad (ASW) to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but He was the ONLY man in history who was supremely successful on both the religious and secular level."

-Michael H. Hart, The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History, New York: Hart Company, Inc. 1978, p. 33.

ভাবার্তঃ "পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় মুহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথম স্থান দেওয়ার ব্যাপরে আমার মনোনয়ন হয়ত অনেক পাঠককে বিস্মিত করতে পারে, এবং অন্যান্যদের দ্বারা আলোচিত হতে পারে, কিন্তু তিনিই ইতিহাসের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন, যিনি পার্থিব ও ধার্মিক এ উভয় ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বেশী সফলতা অর্জন করেছিলেন।" -মাইকেল এইচ. হার্ট, দ্যা ১০০: এ রেংকিক অব দ্যা মোস্ট ইনফ্লুয়েনশিয়াল পার্সন্স ইন হিস্টোরী, নিউ ইয়র্কঃ হার্ট কোম্পানী, আইএনসি. ১৯৭৮, পৃঃ ৩৩।

(দ)

The union of the theorist, organizer, and leader in one man is the rarest phenomenon on this earth; therein consists greatness... In the person of the prophet of Islam the world has seen this rarest phenomenon on earth, walking in flesh and blood.

-Professor K. S. Ramakrisna Rao.

ভাবার্তঃ "এক ব্যক্তির মধ্যে মতবাদকারী, সাংগঠক এবং নেতৃত্বদানকারীর সংযুক্তি হচ্ছে এ বিশ্বপরে একটি অতিদুর্লভ ঘটনা; এখানে ছিলো মাহাত্ম্য... ইসলামের পয়গম্বরের ব্যক্তিত্বে এ জগৎ দেখেছে পৃথিবীর বুকে সর্বাপেক্ষা দুর্লভ এক অত্যাশ্চর্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতা, রক্তে মাংসে বিচরণশীল।" -প্রফেসর কে.এস. রামাকৃষ্ণ রাও।

"এ কিতাব বিশ্বজগতের প্রতিপালকের তরফ থেকে নাজিলকৃত, এতে কোন সন্দেহ নেই'' [সূরা সাজদা: ২]।

পরিচ্ছেদ ২

যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস হচ্ছে আল-কুরআন

কুরআনে পাকের রচয়িতা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

অর্থাৎ, "তিনি মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু নিজ অনুগ্রহে তোমাদের অধীন করেছেন; এতে রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন" [সূরা জ্বা-ছিয়া (৪৫):১৩]

এ আয়াতে করীমে আল্লাহ পাক স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন যে, সৃষ্ট জগতের সবকিছু মানুষেরই অধীন। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্ট জগতের শক্তিকে আপন কল্যাণহেতু ব্যবহার করতে সক্ষম, কারণ এ জগত তাঁর আওতাধীন। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সত্য উদঘাটন হয়েছে যে, মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে জগতের ব্যাপ্ত-সুপ্ত শক্তিকে নিজের অধীন করার ক্ষমতা রাখে। আজকের বিজ্ঞান এ ঘোষণার সুফল গ্রহণ করছে সর্বাপেক্ষা বেশী। বিজ্ঞানের অসংখ্য অবিষ্কার ও এর উপকারিতা থেকে আজ কেউই বঞ্চিত নয়।

পবিত্র কুরআনে পাকের এ ইঙ্গিতই মানুষকে সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। মানুষের অসাধ্য কিছুই নয়। স্বভাবে (নেচারে) আল্লাহর প্রদত্ত যাবতীয় শক্তিকে সে চিন্তা-গবেষণা ও রীতিবদ্ধ পদ্ধতির মাধ্যমে আয়ত্বাধীন করে প্রগতিশীল হবে। এটা স্বয়ং প্রভুরই একান্ত ইচ্ছা। তাঁর সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীবি জগতের রহস্য উদঘাটন করবে তাঁরই সৃষ্টিতে লুকানো শক্তিসমূহ আয়ত্বে এনে। তবে এর জন্য তাঁর মহিমার কথা স্বরণ ও গুণকীর্তন করতে হবে। বলতে হবে, "আল-হামদুলিল্লা-হি

রাব্বিল আ-লামীন।” অন্যথায় তাঁর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হবে।

পশ্চিমা সন্দেহবাদী ও নাস্তিকদের পতন অনিবার্য। এরা আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহের সুফল উপভোগ করেও তাঁর অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করে না- শুকরিয়া জ্ঞাপন দূরের কথা। ঐতিহাসিকভাবে দু'টি সত্যধর্ম; ইহুদী ও খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী হয়েও মানব রচিত অনেক কু-প্রথা ও মিথ্যাকে তাদের ধর্মে সংযুক্ত করে আসল তাওহিদী বাণীকে কলুষিত করে দেয়। ফলে আজ কি হলো? ধর্ম নিয়ে তামাসা।

মুসলিম বিজ্ঞান ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রগতিবিরোধী পাদ্রী-শক্তির ধ্বংস করে ইউরোপে রেনেসাঁর সূত্রপাত ঘটালো। কিন্তু তারা মুসলামনদের কাছ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ধার করে নিলো সত্যি- তবে ইসলামের আসল মেসেজকে গ্রহণ করে নিতে অস্বীকৃতি জানালো। তাই ইসলামেরই অনুগ্রহে বিজ্ঞানের পথ ধরে বৈষয়িক উন্নতি সাধন করেও আজ তাদের সমাজে অশান্তি আর অশান্তি বিরাজমান। বৈষয়িক এ উন্নতি শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসহীন মানবাত্মায় আজ চরম বস্তুবাদিত্বের মত ঘৃণ্য শয়তানী ধারণা জন্ম দিয়েছে। এ প্রভু-বিরোধী মতবাদ মানুষকে জঘন্য ষড়-রিপুর আকর্ষণে পশুর মত করে দিচ্ছে। আমরা আজ বড় বড় নেতাদের দেখতে পাই যারা লোভের বশিভূত হয়ে, যৌন তাড়নায়, হিংসার প্রভাবে ও টাকার লোভে তাদের অন্তরে লালিত গুপ্ত শয়তানী কুমন্ত্রণাকে জনসমক্ষে প্রতিনিয়ত উম্মোচিত করছেন। অন্তরে এ কু-প্রবৃত্তি লালিত হয়ে মানুষকে গ্রাস করে দেয়, একটি মাত্র কারণে; ঈমানী নূরের অভাব। হৃদয়ে ঈমানের শক্তি সহকারে কেউ যদি বিত্তশীল হয় তবে তা মানবতার জন্য কল্যাণকর।

বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানবজীবনের উন্নতিসাধন তাই কোন ক্রমেই দুনিয়াদারী বা দুনিয়ার প্রতি বেশী আকর্ষণ বুঝায় না- যদি অন্তরে ঈমান থাকে, প্রভুর প্রদত্ত এ অনুগ্রহের স্বীকারোক্তি ব্যক্ত হয়, শুকরিয়ার কণ্ঠ বুলন্দ থাকে। জগতকে ঘুরে দেখা, এর থেকে প্রাপ্ত ধন-অনুগ্রহকে আহরণ করা, ধাপে ধাপে উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়া এবং সেই সাথে প্রভুর আনুগত্য করাই মানব-সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

ইসলাম একটি প্রগতিশীল ধর্ম। এতে কোন সন্দেহ নেই। পবিত্র কালামে তাই আল্লাহ পাক পরোয়ার দেগারে আলম ঘোষণা করেন:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থাৎ "বলো, পৃথিবী ঘুরে দেখ অনুসন্ধান করে; লক্ষ্য করো কিভাবে তিনি (আল্লাহ) সৃষ্টি শুরু করেছেন (সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করো), পরে আল্লাহ পূণর্বার (ধ্বংসের পরে) উঠাবেন (মানুষকে আবার পুণরুত্থিত করবেন কিয়ামত দিবসে); আল্লাহ সকল বিষয়ে শক্তিশালী" [আনকাবুত (২৯) :২০]।

এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করার জন্য। আর এ গবেষণার মাধ্যমে মানুষের অগ্রগতি নিহিত। পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে গিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত সৃষ্টি-রহস্য উদঘাটন করলে মানুষের যেমন উন্নতি হবে, তদ্রূপ প্রভু ও তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে তারা সম্যক অবগত হতে পারবে। সুতরাং পরকালে অবিশ্বাস করার কোন কারণ থাকতে পারে না। সৃষ্ট জগত- এর অসংখ্য রহস্য আর সৃষ্টি-কৌশলই মানুষকে এ বিশ্বাসের খোরাক যোগায়। এখানে আল্লাহ পাক বিজ্ঞানের পদ্ধতি অবলম্বনে অগ্রসর হওয়ার জন্য সুস্পষ্ট তাগিদ দিয়েছেন, কারণ গবেষণা সঠিকভাবে করতে হলে বিজ্ঞানের মাধ্যমেই করতে হবে। আল্লাহ কিভাবে এ জগতকে সৃষ্টি করলেন ও পরিচালিত করছেন, তা যদি কারো জ্ঞানে আসে তবে সে আশ্চর্য না হয়ে পারবে না। ঈমানের আলোকে যখন এসব রহস্য সে অবলোকন করে, তখন সে এমনিতেই আল্লাহর অসীম ক্ষমতা অনুধাবন করতে পারে। সে তখন কৃতজ্ঞতায় নতমস্তকে আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। স্বচক্ষে দেখা কোন কিছু কি অস্বীকার করা যায়? বাস্তবে অবিশ্বাসীরা এসব সৃষ্টি-রহস্য দেখে এবং এ থেকে অনুগ্রহ উপভোগ করেও, মূলতঃ আল্লাহর অস্বিত্বকে স্বীকার করতে পারে না। কেন পারে না? কারণ তার মধ্যে ঈমানের আলো অনুপস্থিত। ঈমানদার জ্ঞানী আর বে-ঈমান জ্ঞানীদের মধ্যে তাই দিন ও রাতের মতো তফাৎ।

এটা এবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলা যায় যে, যাবতীয় জ্ঞানের উৎস হচ্ছে আল-কুরআনুল হাকীম। এ পবিত্র গ্রন্থে মানুষের সৃষ্টি রহস্য থেকে সৃষ্ট-জগতের রহস্য ও এর চূড়ান্ত পরিণতি প্রভৃতি সবকিছু সংক্ষিপ্ত ও ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়েছে। কোন বিজ্ঞানী বা জ্ঞানবান ব্যক্তি- যার মধ্যে ঈমানী শক্তি নিহিত থাকে, তিনি অনায়াসেই আল্লাহর আনুগত্য ও শুকরিয়া আদায় করবেন। পশ্চিমা অন্ধত্ব ও অপপ্রচার তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আর দূর্বল ঈমানের অধিকারী কিছু মুসলমান নামধারীদের সন্দেহ প্রবল হয়ে পশ্চিমাদের ফাঁদে তারা আটকা পড়বে এবং ইদানিং পড়ছেও অনেকে। আমি সবাইকে দৃঢ়চিত্তে আল্লাহর নাম স্মরণ করে বলছি, যে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে অবিশ্বাসীরা, নাস্তিকরা, সন্দেহবাদীরা ও মুনাফিকরা সত্যধর্ম ইসলাম নিয়ে বিভ্রান্তিকর কথা বলে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সময় সময় অজ্ঞতাপ্রসূত বাক-বিতণ্ডা মাত্র। বিজ্ঞান কখনো মুসলমানের ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে না, বাস্তবে কখনো করে নি। আপন ধর্ম, পবিত্র ঐশীবাণী আল-কুরআন এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতার সদ্যবহারই এরা করছে। বিজ্ঞানের প্রতিটি অবিসংবাদিত সত্য (অনেক বিজ্ঞানের তথ্য সময় সময় ভুল বলেও প্রমাণিত হয়-তাও মনে রাখা জরুরী) আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও কুরআনের সাথে অসামঞ্জস্য মোটেই নয়। আর তা হবে কি করে? মহাবিশ্ব ও জগতসমূহের স্রষ্টাই যে এ মহান গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি তাই তাঁর রচনা যে নির্ভুল, সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

অর্থাৎ "এ কিতাব যাবতীয় ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত; মুত্তাক্বীদরে জন্য পথ-প্রদর্শক" [বাক্বারাহ (২): ২]।

একথা আমরা ভাল করে প্রমাণ করলাম যে, কুরআন শরীফ হচ্ছে মহাবিজ্ঞানী (আল-হাকীম) আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজ্ঞানপূর্ণ হিদায়াতের প্রেরিত বাণী। তাঁর সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবজাতির জন্য এ সত্যজ্ঞান একটা মহা-উপহার। বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সবাই এ সত্যকে মেনে নিয়েছে। এটা যে মানুষের রচনা হতে পারে না সে ব্যাপরে কারো দ্বিমত নেই। অবশ্য কিছু কিছু অর্ধ-শিক্ষিত বা জ্ঞান-পাপী মুনাফিকরা সন্দেহ করতেই থাকবে। আল্লাহর বাণী সম্পর্কে এরূপ ধারণা যে কত

জঘন্য তা, যে কোন বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই অনুধাবন করতে পারবেন। এরা কি মনে করে যে অ-মুসলিম, নাস্তিকের দ্বারা অবিষ্কৃত কোন বৈজ্ঞানিক সত্য উদঘাটন বা মানবকল্যাণকর কোন মহৎ কার্য সম্পাদনের পেছনে, আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুগ্রহ কাজ করছে না? নাস্তিক হলেও তার দেহ, জীবন, মস্তিষ্ক, অন্তকরণ কে পরিচালিত করছে? সে-ও তো আল্লাহর 'বান্দাহ'। তাই মানবজাতির "যাবতীয়" উৎকর্ষসাধণই একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায় হচ্ছে। তা সম্পাদন করতে তিনি নাস্তিক, আস্তিক, সন্দেহবাদী, মুনাফিক এবং ঈমানদারদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে ব্যবহার করতে পারেন। তাঁর এ একচ্ছত্র অধিকার আছে সবার উপরে, কারণ তিনিই সবাইকে সৃষ্টি করে অসংখ্য অনুগ্রহ দান করেছেন এ পৃথিবীতে, যা থেকে সবাই উপকৃত হচ্ছে। তাই কেউ যদি বলে, "আমরা অ-মুসলমানরা- এই এই উন্নতি করেছি।" এতে তাদের বাস্তবে কোন গৌরবের কিছুই নেই। আল্লাহর অনুগ্রহ হেতু তা তাদের দ্বারা সম্ভব হয়েছে মাত্র।

আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের মালিক ও সবার প্রভু। মুসলমান হিসেবে এ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতির দিনে এসব ব্যাপারে আমাদের অবগত থাকাটা একান্ত জরুরী। একই সাথে একথাটাও বুঝতে হবে যে, কুরআনে পাকে প্রকাশিত জ্ঞান, সকল জ্ঞানের উৎস। বিজ্ঞানসহ মানুষ আজ যত ধরনের জ্ঞান সাধনাই করুক না কেন, তা সবই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, বা তার ইঙ্গিত দেওয়া আছে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান থেকে বাহ্যিক জ্ঞান-বিজ্ঞান পর্যন্ত সবকিছুই এ মহান ঐশী গ্রন্থে বিদ্যমান। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সৃষ্টির রহস্য অনুসন্ধান হেতু মানুষ দ্রুত এগুচ্ছে। আল্লাহকে স্বীকার করে তাঁর নির্দেশ মান্য করে নিলেই, এ অনুসন্ধান হয়ে যায় কল্যাণকর ও মানবজীবনের জন্য সার্থক।

পৃথিবীর প্রথম মানবসন্তান যিনি চন্দ্রের উপর পদার্পণ করেছিলেন তিনিও শেষ পর্যন্ত ঈমানদার হয়ে গেলেন। নীল আমস্ট্রং আল্লাহর কুদতরকে স্বচক্ষে অবলোকন করেই ঈমানের নূরে আলোকিত হয়েছিলেন। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভবিষ্যতে মানুষ ধীরে ধীরে জ্ঞানের আলোকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে।

"এ কিতাব যাবতীয় ভুল-ত্রটি থেকে মুক্ত; মুত্তাক্বীদরে জন্য পথ-প্রদর্শক" [সূরা বাকারা: ২]।

পরিচ্ছেদ ৩

আল-কুরআনের আলোকে বিজ্ঞান

ঈমান তথা দ্বীন ও বিজ্ঞানের উপর গবেষণায় ইসলামের পবিত্র ঐশিগ্রন্থ আল-কুরআনকে উপেক্ষা করার কোন উপায় নেই। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কিন্তু এটা এখন সর্বজনবিদিত সত্য যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য ও থিওরীর সঙ্গে ১৪০০ বছর পূর্বে নাজিলকৃত মহান কুরআন শরীফে বর্ণিত অনেক আয়াতমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞানের উন্নয়ন যতো বেশি হচ্ছে, এই জ্ঞানের আলোকে আমরা কুরআনকে ততো বেশি বুঝতে সক্ষম হচ্ছি। এই সত্য উদঘাটনের পর '**ঈমান বিল গায়েবে**' বিশ্বাস সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকে না। তবে বাংলা ভাষায় কুরআনের আলোকে আধুনিক বিজ্ঞানের স্বরূপ নিয়ে এখনও গভীর কোন গবেষণা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। যা হয়েছে, তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিদেশী ভাষায় লিখিত কিছু গ্রন্থের অনুবাদের মাধ্যমেই হয়েছে বলে দেখা যায়। বিশেষ করে আধুনিক যুগে ফরাসী লেখক ডা. মরিস বুখাইলীর 'দ্যা বাইবেল দ্যা কুরআন এণ্ড সাইন্স' বইটি বাংলায় প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকেই উপকৃত হয়েছেন। এটা একটি মূল্যবান গবেষণা, তা স্বীকার করতেই হয়।

বইটিতে ডা. বুখাইলী মূলতঃ ইয়াহুদিদের পুরাতন টেস্টেমেন্ট (তাওরাত), খৃস্টানদের নিউ টেস্টেমেন্ট (বাইবেল) ও ইসলামের ঐশীগ্রন্থ আল-কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এককভাবে শুধুমাত্র কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আয়াতের উপর ব্যাপক কোন গবেষণা এখনও কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই। আমার এ লেখাও সে পর্যায়ের কোন গবেষণা নয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এখানে বর্ণিত আয়াতমালা ও

এরসঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের মিল আমার নিজস্ব গবেষণার ফসল। পাঠকরা দেখবেন ডা. বুখাইলীর গবেষণার পরেও যেসব বৈজ্ঞানিক নতুন তথ্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলোর সঙ্গে কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন আয়াতের কী অপূর্ব সামঞ্জস্য বিদ্যমান।

সময়ের আপেক্ষিক ধারণা

আপেক্ষিতাবাদের প্রবর্তক হচ্ছেন বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন [১৮৭৯-১৯৫৫]। গেল (বিংশ) শতকের প্রথম দু'দশকের মধ্যে তিনি এই থিওরীটি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন। আগের খণ্ডে আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এই মতবাদটি এখন সাবাই সত্য বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নীরিক্ষার মাপকাঠিতে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

আপেক্ষিকতাবাদের মৌলিক দিকটি হচ্ছে সময় নিয়ে। আইনস্টাইন সময় বলতে যা বুঝায় তার নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে আসলে এবস্যুলুট টাইম বা ধ্রুব সত্য সময় বলতে কিছু নেই। এটা ভিন্ন অবস্থা ও অবস্থানে অস্তিত্বশীল ভিন্ন ব্যক্তি বা পর্যবেক্ষকের কাছে ভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হবে। অর্থাৎ সময় পর্যবেক্ষকের গতি, অবস্থান ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। তিনি দেখিয়েছেন আইজাক নিউটনের [১৬৪২-১৭২৭] ধারণা মতো এবস্যুলুট সময় বলতে কিছু থেকে থাকলে বিশ্বের কোথাও একটি স্থির বিন্দুর প্রয়োজন যার উপর ভিত্তি করে (রেফারেন্স করে) সময়কে মাপা যায়। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান দেখিয়েছে, এরূপ কোন স্থির বিন্দু এ মহাবিশ্বের কোথাও বিদ্যমান নাই। সমগ্র বস্তু জগতটাই মূলত গতিশীল। এছাড়া সময় মহাকর্ষ ও আলোকের গতির সঙ্গেও সম্পর্কিত। বিরাট মহাকর্ষের ফোর্স সময়কে ধীর গতিসম্পন্ন করে দেয় এবং আলোকের কাছাকাছি গতিতে গতিশীল কোন বস্তুর উপর দিয়ে বহির্বিশ্বের তুলনায় সময় আস্তে চলে। অর্থাৎ সময় স্থান বা স্পেইসেরই একটি ডাইমেনশন বা বিস্তৃতি। এটা বাস্তবে মহাবিশ্বের চতুর্থ বিস্তৃতি যাকে আইনস্টাইন **'স্থান-কাল কন্টিনিউয়াম'** নামকরণ করেছেন।

সময় সম্পর্কে এসব অদ্ভুত অথচ বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য তথ্য জানার পর বস্তু জগত নিয়ে আমাদের যতো ধারণা ছিলো তা পাল্টে যায়। সময়ের এসব তথ্য কিন্তু নতুন কিছু নয়। আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে আল-কুরআনে সময় সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তা সময়ের আপেক্ষিকতাকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে।

এবার পবিত্র কুরআন শরীফে বর্ণিত কয়েকটি আয়াত নিয়ে এখানে আলোচনা কবরো- এগুলো প্রতিটিই সময়ের ধারণা সম্পর্কে আমাদের শিক্ষা দেয় এবং আইনস্টাইনের আপেক্ষিতাবাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল হিসেবে প্রমাণিত হয়।

একদিন হাজার বা পঞ্চাশ হাজার বৎসর

আল-কুরআনে দু'টি আয়াত আছে যা আমাদেরকে সময় সম্পর্কে ভাবিয়ে তুলে। এর প্রথমটি হলো:

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّون

অর্থাৎ "তারা আপনার নিকট তড়িৎ আজাব হওয়া চায়, অথচ আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না, তোমার প্রতিপালকের একদিন তোমাদের হিসাবে হাজার বছরের সমান" [সূরা হাজ্জ (২২): ৪৭]।

এখানে সময় সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ পরিষ্কার ভাষায় সময়ের মানবিক ধারণাটি যে আদৌ ধ্রুব সত্য কোন ধারণা নয় তা জানিয়ে দিয়েছেন। এছাড়া আল্লাহর নিকট একদিন আমাদের হিসাবে **'হাজার বছরের সমান'** কথাটির মাধ্যমে আপেক্ষিকতাকে বুঝাচ্ছে। সুতরাং স্বয়ং সময়কেই যদি আমরা বুঝতে অপারগ হই তাহলে কোন্ সময় কি হবে, কিংবা কবে কিয়ামত সংঘটিত হবে এসব প্রশ্ন মূলতঃ অর্থহীন। এখানে একদিন সমান এক হাজার বছর কথাটি আসলে আপেক্ষিকতাকে বুঝানোই উদ্দেশ্য কারণ, অন্যত্র আল্লাহ

পাক তাঁর নিকট একদিন মানুষের হিসেবে ৫০ হাজার বছরও বলেছেন। এই দ্বিতীয় আয়াতটি হলো:

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

-"ফেরেশতা ও আত্মাসমূহ এমন একদিন তাঁর (আল্লাহর) দিকে উঠবে যার পরিমাণ [তোমাদের হিসেবে] পঞ্চাশ হাজার বছর" [সূরা মাআরিজ (৭০):৪]।

এখানে স্পষ্ট একদিন (আল্লাহর নিকট) আমাদের হিসাবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমপরিমাণ বলা হয়েছে। সুতরাং সময় যে আপেক্ষিক এবং এটা আমাদের নিজস্ব হিসাব ও ধারণার উপর নির্ভরশীল এ কথাটি স্বয়ং রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। আইনস্টাইন বৈজ্ঞানিক উপায়ে গেল শতকে এর প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন মাত্র।

সময় ভিন্নভাবে চলমান হতে পারে

আপেক্ষিকতাবাদ ভিন্নগতিশীল বস্তুর উপর দিয়ে সময় ভিন্নভাবে চলমান হওয়ার কথা প্রমাণ করেছে। বিশেষকরে আলোকের গতির কাছাকাছি গতিতে কেউ চলতে পারলে সময় যে তার উপর দিয়ে বাইরের জগতের তুলনায় ধীরে চলবে এ কথাটি জেনে আমরা সবাই অবাক হয়েছি। বাস্তবে পরমাণুকে উচ্চগতিশীল করে এই তথ্যটি পরীক্ষিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে টুইন প্যারাডক্সের কাহিনীর বর্ণনা পড়েছি। সময় যে ভিন্ন পর্যবেক্ষকের কাছে এবং ভিন্ন গতিশীল পর্যবেক্ষকের নিকট ভিন্ন হয়ে থাকে তা আজ বিজ্ঞানসম্মত সত্য। তবে এ ধারণাটি মূলত কুরআন শরীফের। আসহাবে কাহাফের ঘটনায় সময়ের কারসাজি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আহসাবে কাহাফের যুবকদেরকে জালিম বাদশাহর হাত থেকে রক্ষা করতে আল্লহ পাক একটি গুহার ভেতর তাদের শত শত বছর ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে দিলেন,

অথচ যুবকরা জেগে উঠে ভাবলেন তারা একদিন কিংবা এরচেয়ে কম সময় নিদ্রিতাবস্থায় ছিলেন। এতে এটাই বুঝা যাচ্ছে যুবকদের উপর দিয়ে সময় চলেছে অতি ধীর গতিতে, অপরদিকে গুহার বাইরে পৃথিবী স্বাভাবিকভাবেই চলেছে। সেই যালিম বাদশার যুগ অতিবাহিত হয়ে অনেক ইতিহাস রচিত হওয়ার পর একজন ঈমানদার বাদশাহ যখন ক্ষমতায় আরোহণ করলেন তখন এই যুবকরা আবার জেগে উঠলেন। [দেখুন, কুরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহাফের ঘটনা, সূরা কাহাফ আয়াত ৯-২২]

সময় যদি এই যুবকদের উপর দিয়ে স্বাভাবিকভাবে চলতো তাহলে তাদের দেহ পঁচে গলে মাটির সঙ্গে মিশে যেতো। কিন্তু বাস্তবে তাঁরা এই শত শত বছর গত হওয়ার কথা টেরই পেলেন না। এই ঘটনার সঙ্গে আইনস্টাইনের টুইন প্যারাডক্স কাহিনীটির কী অপূর্ব মিল বিদ্যমান, লক্ষ্য করেছেন কি? এ কাহিনীটি দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে।

সময়ের উল্টো গতি ও কিয়ামতের বর্ণনা

হ্যাঁ, কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব। অনেক বিজ্ঞানীরা এই সম্ভাবনার উপর থিওরী তুলে ধরেছেন। আর তাদের এসব কথা কুরআনে বর্ণিত কিয়ামত দিবসে পৃথিবী ও মহাকাশের করুণ দশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক থিওরী হচ্ছে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পুনরুত্থানকে বুঝিয়ে দেওয়া এখন অসম্ভব নয়। বিজ্ঞান কি শেষ পর্যন্ত ধর্মবিশ্বাসের এই সর্বাপেক্ষা মৌলিক বিষয়টিকেও গ্রহণ করতে যাচ্ছে? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে এই পুনরুত্থান সম্পর্কেই কাফির-বেঈমানরা বেশি পীড়াপীড়ি ও তর্কবিতর্ক করেছিলো। আল্লাহ পাক তাই কুরআনে পাকের অনেক স্থানে কিয়ামত দিবসের উপর বহু তথ্য প্রকাশ করেছেন। এসব মহাসত্য পবিত্র আয়াতমালা ও বিজ্ঞানের ধারণার উপর এবার বিস্তারিত আলোচনা করে দেখা যাক।

পুনরুত্থান সম্পর্কে কাফিরদের প্রশ্ন

কাফিররা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পুনরুত্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করতো:

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ

অর্থাৎ "আমরা যখন মরে যাব, এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব?" [সূরা সাফ্‌ফাত (৩৭):১৬]। জবাবে রাব্বুল আলামীন বলেন:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ

অর্থাৎ "মানুষ মনে করে, আমি তাদের কঙ্কাল আবার পুনর্গঠন করবো না [করতে পারবো না]; অবশ্যই [করবো], আমি তার প্রতিটি অঙ্গুলি পুনর্গঠন করতে সক্ষম" [সূরা ক্বিয়ামাহ (৭৫):৩-৪]। অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ

অর্থাৎ "এবং এ কারণে যে, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে সন্দেহ নেই এবং এ কারণে যে, কবরে যারা আছে, আল্লাহ তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন।" [সূরা হাজ্জ (২২):৭]।

পবিত্র কুরআন শরীফে পুনরুত্থান সম্পর্কে আরও বহু আয়াত আছে। মুসলমানদের এ ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস রাখা ঈমানের মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কিন্তু সন্দেহবাদী ও কাফিররা এ ব্যাপারে যুক্তির অভাবকে সম্বল করে তা উড়িয়ে দিতে চায়। যারা বিশ্বাসী তাদেরকে কোন যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বুঝানো আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহর পবিত্র কালাম, তাঁর প্রতিশ্রুতি এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী তথা হাদীস শরীফই তাদের জন্য যথেষ্ট। তবে যে বিজ্ঞানকে

সম্বল করে ইসলামের এই মৌলিক বিশ্বাসকে তারা উড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছে এবং ঈমানে দুর্বল অনেক মুসলমানকেও বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পাচ্ছে, সেই বিজ্ঞান আজ কি বলছে, তা একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখা যাক।

চরম যুক্তিবাদী ও কিছু বিজ্ঞানীর প্রশ্ন হচ্ছে, মৃত্যুর পরে আমাদের কি হয়? আমাদের দেহ তো পঁচে-গলে মাঠির সঙ্গে মিশে যাবে। আর আত্মা? আত্মা কি দেহ থেকে বের হয়ে আধ্যাত্মিক কোন জগতে চলে যায়? বাস্তবে আত্মা যেহেতু কোন জড়বস্তু নয় তাই বিজ্ঞান এ ব্যাপারে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে অপারগ। কিন্তু দেহ তো জড়-পদার্থের তৈরী। আর পুনরুত্থান সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে যা বলা হয়েছে তাতে এটা স্পষ্ট যে, মানুষ কিয়ামত দিবসে সশরীরেই পুনরুত্থিত হবে। আর এখানেই বিজ্ঞান ও যুক্তির সঙ্গে সংঘাত।

তবে আজকের বিজ্ঞানই বলে দিচ্ছে, পুনরুত্থান একটি ফিজিক্যাল (বাস্তব) সম্ভাবনা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক এই প্রমাণ আগেই বলেছি ঈমানদারদের জন্য জরুরী নয়। আর যারা অবিশ্বাসী তাদের কথা স্বতন্ত্র। হৃদয় যদি কিছু মানতে চায় না তবে কি করে তারা বিশ্বাস করবে? তারা চোখের সামনে শত শত প্রমাণ অবলোকন করেও বিশ্বাস করে না। কুরআন শরীফ যে আল্লাহর বাণী, তা আজ সর্বাপেক্ষা কট্টর নাস্তিকরাও স্বীকার করে নিয়েছে। তথাপি তাদের মুখে কালেমা তায়্যিবার পবিত্র বাণী উচ্চারিত হয় না। বস্তুত সত্য ধর্মবিশ্বাস (অর্থাৎ ইসলামে বিশ্বাস) ও সত্যোপলদ্ধি একটি নূর, যা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যক্তির মধ্যে জন্মলাভ করে। আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া এ নূরের অধিকারী কোন মানুষই হতে পারে না, সে যতো বড় বিজ্ঞানী বা প্রজ্ঞাবানই হোক না কেন।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, কুরআন শরীফের অনেক স্থানে এই মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ ও কিয়ামত দিবস সম্পর্কে বহু তথ্য বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি বর্ণনাই শেষ একটি ধ্বংসলীলার দিকে ইঙ্গিত করে। কোন একদিন যার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকট রক্ষিত, এই পৃথিবীসহ সমগ্র মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। অনেক জায়গায় এই সর্বশেষ মহাপ্রলয় সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বার বার বলা হয়েছে,

মানুষ তখন দেখবে সে জীবিত থাকতে কি করেছিলো। তার হাত-পা সাক্ষী দেবে- অর্থাৎ সব কাজকর্ম সে পুনরায় করে দেখাবে।

এ প্রসঙ্গে কুরআনের এসব তথ্য ও একটি নতুন বিশ্বতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হবে। আমরা দেখবো কিভাবে বিশ্বজগত একদিন বিস্তৃত হওয়া থেকে থেমে আবার সংকোচিত (কনট্রাকশন ফেইজ) হবে এবং সময় উল্টো দিকে প্রবাহিত হয়ে আমাদেরকে কবর থেকে উত্থিত করবে! সময় উল্টো দিকে চলার সম্ভাবনাই হচ্ছে এই নতুন থিওরীর মৌলিক বক্তব্য। এবার কুরআনে বর্ণিত কিছু আয়াতমালা নিয়ে একটু গবেষণা করে দেখা যাক।

কিয়ামত দিবসের উপমা বর্ণনা করতে গিয়ে সূরা ফাতিরের ৯ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَاللَّهُ الَّذِى أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ النُّشُورُ

অর্থাৎ "আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর সে বায়ু মেঘমালা সঞ্চারিত করে। অতঃপর আমি তা মৃত ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর তদ্বারা সেই ভূখণ্ডকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করে দেই। এমনিভাবে হবে পুনরুত্থান।" (সূরা ফাতির (৩৫):৯)

মেঘমালা উত্থিতকরণ এবং বৃষ্টির পর মৃত বৃক্ষ-তরু-লতা জ্যান্ত হওয়াটা অবশ্যই একটি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। আধুনিক যুগে এসে মানুষ বিজ্ঞানের সুবাদে কোন্ উপায়ে এই জ্যান্তকরণ হচ্ছে তা বুঝাতে সক্ষম হয়েছে। সেযুগের মানুষের নিকট অনেক প্রাকৃতিক ঘটনার মতো এটাও একটা অলৌকিক ঘটনা বলে চিহ্নিত ছিলো। তবে এটা যে একটি সত্যিকার ফিজিক্যাল প্রসেস বা স্বভাবের আইনের আওতাভূক্ত একটি ব্যাপার তা কুরআন এবং বিজ্ঞান থেকে স্পষ্ট। আর এই ঘটনার সঙ্গে পুনরুত্থান দিবসের তুলনা করায় মনে হয় সেই ঘটনাটিও একটি ফিজিক্যাল প্রসেস হবে। সেসময় প্রাকৃতিক আইনের বিশেষ কোন উপায়ে তা

সংঘটিত হবে। আর মনে রাখতে হবে, প্রতিটি প্রাকৃতিক আইনও অবশ্যই আল্লাহর সৃষ্ট এবং তাঁর দ্বারা সদা-নিয়ন্ত্রিত।

কুরআন শরীফে বিচারদিবস সম্পর্কে যেসব তথ্য দেওয়া আছে তা ৪টি মৌলিক বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। এগুলো হলো: [১] শেষ মহাপ্রলয় এবং পৃথিবীটা একটি ফাঁফা বা শূন্যগর্ভ গোলকে পরিণত হওয়া (সূরা, যিলযাল: ১-২), [২] কবর থেকে পুনরুত্থান, [৩] একটি কাল যখন আমাদের নিজেদের হাত-পা-জিহ্বা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে এবং [৪] আকাশের তোরণ বা গেইটসমূহ খুলে যাবে [সূরা নাবা (৭৮): ১৯] এবং মানুষ ধ্বংসের কবলে পতিত জড়বিশ্ব থেকে অন্য কোন বিশ্বে বা বিস্তৃতিতে চলে যাবে।

কুরআন শরীফে বর্ণিত এসব ফিজিক্যাল অবস্থা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বুঝানো সম্ভব। সময় বা মহাকাল যদি উল্টো দিকে চলে তাহলে বিজ্ঞানের মতে মহাকর্ষ (গ্রাভিটি) পাল্টে যেতে বাধ্য। অর্থাৎ সময় যদি পেছনের দিকে চলে তবে বস্তু নীচের দিকে পতিত না হয়ে উপরের দিকে পড়বে! এ কথটা যদিও অবিশ্বাস্য মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে তা-ই হবে। কেন হবে, তা এবার আলোচনা করে দেখা যাক। আমরা ইতোমধ্যে বিভিন্ন কজমোলজিক্যাল (বিশ্বতত্ত্বের উপর গবেষণামূলক) থিওরী নিয়ে দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এবার দেখা যাক কুরআন শরীফে কজমোলজিক্যাল তথ্যাদি কিভাবে বর্ণিত হয়েছে।

কুরআনে বর্ণিত বিশ্বতত্ত্ব বা কজমোলজি

আমরা জানি আধুনিক বিজ্ঞানের মতে এই মহাবিশ্ব বিলিয়ন বিলিয়ন বছর পূর্বে একটি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল। এ ঘটনার কথা কুরআনে স্পষ্টভাষায় বলা হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

অর্থাৎ "যারা অবিশ্বাসী তারা কি জানে না যে, মহাবিশ্ব ও পৃথিবী একত্রে ছিলো এবং আমি তাদেরকে বিভক্ত করেছি, এরপর প্রত্যেক প্রাণীকে আমি পানি থেকে সৃষ্টি করেছি; তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না?" [আম্বিয়া (২১): ৩০]।

এখানে লক্ষণীয় যে, মহাবিস্ফোরণ থিওরী ও পানি থেকে প্রাণীর উৎপত্তি এই উভয়ের আবিষ্কারকরা ছিলেন মূলত যারা অবিশ্বাসী তারা। কুরআন থেকে এটা স্পষ্ট যে, এ ব্যাপারে অবিশ্বাসীরাই আগে জানবে কিন্তু তারা বিশ্বাস করবে কি না সেব্যাপারে স্বয়ং রাব্বুল আলামীনই প্রশ্ন করছেন। বিষয়টা কি ভাববার নয়?

বিশ্বের প্রাথমিক পর্যায়ে যাবতীয় জড়বস্তু একত্রে ছিলো। তারপর এটা বিভিন্ন গ্যালাক্সি, নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহে পরিণত হয়। এছাড়া বিশ্বজগত যে দিন-দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে তা কুরআন শরীফের একটি আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখিত হয়েছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَالسَّمَآءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

অর্থাৎ "এ আকাশ (আকাশের যাবতীয় কিছু - মহাবিশ্ব) আমি শক্তিসহকারে সৃষ্টি করেছি এবং আমি এটাকে সম্প্রসারিত করছি" [জারিয়াত (৫১):৪৭]।

বিশ্বজগতের ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে অনেক আয়াত আছে। এটা যে একদিন ধ্বংস হবে সে ব্যাপারে আয়াতমালা ছাড়াও কুরআন শরীফে কনট্রাকশন ফেইজের (সংকোচণ হওয়ার) কথা স্পষ্ট উল্লেখিত হয়েছে। একটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ

অর্থাৎ "সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র; যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব, আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে।" [আম্বিয়া (২১):১০৪]।

এখানে বিছানো বা সম্প্রসারিত জগতকে আবার ছোট করে দেওয়া হবে একথা স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া আয়াতের দ্বিতীয় অংশে 'পুনরায় সৃষ্টি' কথাটি দ্বারা আমাদের ইহলৌকিক কাজকর্মের পুনরাবৃত্তির কথা বলা হয়েছে। বিজ্ঞানও বলছে কনট্রাকশনের সময় কালের গতি উল্টো দিকে চলার সম্ভাবনা আছে। এরফলে জগতের যাবতীয় ঘটনা আবার ঘটবে- কিন্তু এসময় উল্টোদিকে এসব ঘটনা চলমান থাকবে। সময়ের এই অদ্ভুত ব্যপার নিয়ে আরও ব্যাপকভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

সময় উল্টো চলার ব্যাখ্যা

সময় হচ্ছে জগতের সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত এক বস্তু। এটাকে দেখা যায় না অথচ এর প্রভাব থেকে কেউ বা কোন কিছুই মুক্ত নয়। সময় সম্পর্কে এখনও বিজ্ঞানীরা তেমন বেশী কিছু জানেন না। এটা এক বিরাট রহস্য হয়েই আছে। বিংশ শতকের বিজ্ঞানী যেমন আইনস্টাইন সময়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করেছেন মাত্র। বিভিন্ন অবস্থায় সময় কিভাবে দ্রুত বা আস্তে চলতে পারে তা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন আপেক্ষিকতা থিওরীর মাধ্যমে। তার মতে সময় গতি বৃদ্ধির সাথে ধীরে চলে।

আলোকের কাছাকাছি গতিতে কোন বস্তু চলতে থাকলে সময় ঐ বস্তুর উপর দিয়ে অত্যন্ত ধীরে ধীরে অতিবাহিত হয়। অন্যকথায় সময়ের ক্রিয়া স্তিমিত হয়ে যায়। এছাড়া পৃথিবী, সূর্য প্রভৃতি মোটা অঙ্কের জড়বিশিষ্ট বস্তুর কাছাকাছি সময় ধীরে

চলে। অর্থাৎ যে বস্তুর মধ্যে মধ্যাকর্ষণ শক্তি যতো বেশী সে বস্তুর নিকটে সময়ও ততো বেশী ধীরে চলবে। ব্ল্যাক হোল নামক অত্যন্ত শক্তিশালী মহাকর্ষবিশিষ্ট বস্তুর ভেতর সময় প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। সময় সর্বদাই ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হয়। আমরা দেখতে পাই বৃষ্টির পানি নীচের দিকে পড়ে, মানুষ বুড়ো হয়। আমরা কখনও দেখিনা, কেউ বুড়ো থেকে জৌবন ফিরে পেতে, মত্যুর পর জীবিত হতে কিংবা কোন কাচখণ্ড ভেঙ্গে যাওয়ার পর এমনিতেই জোড়া লাগতে। তবে হ্যাঁ, কোন চলচিত্রে যদি একটি ঘটনা ধারণ করে রাখা হয় এবং ভিসিআর-এ ফিল্ম রিভার্স করে পরিচালিত হয় তবে উপরোক্ত ঘটনাবলী আমরা দেখতে পাই। নিশ্চয়ই পাঠকরা দেখেছেন কিভাবে ভাঙ্গা ঘর আবার উল্টো দিকে জোড়া লাগে কিংবা ছবির লোকেরা উল্টো দিকে চলে বিভিন্ন কর্ম করেন। চলচিত্রের ছবি রিভার্স করার সময় যেভাবে সবকিছু উল্টো দিকে ঘটতে থাকে ঠিক তদ্রূপ সময় যদি সত্যিকার অর্থেই উল্টো দিকে চলতে থাকে তবে আমরা অতীতে কৃত সবকিছু আবার করতে থাকবো। কিন্তু সময় কি কখনও এভাবে চলতে পারে?

এ প্রশ্নের জবাবে এটুকু বলা যায় যে, সময় যখন আলোকের গতির কাছাকাছি গতিতে কিংবা ব্ল্যাক হোলোর কাছে স্তব্ধ হতে পারে তবে অন্য কোন অবস্থায় তা উল্টো দিকে না চলার নিশ্চয়তা কি? এই সম্ভাবনা সম্পর্কে অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরাও আজ চিন্তাভাবনা করছেন। মাইকেল ব্যারী, থমাস গো এবং স্টিভেন হোকিং এর মতো প্রখ্যাত কজমোলজিস্টরাও এদের মধ্যে ক'জন। তারা থিওরী উপস্থাপন করেছেন যে, কনট্রাকশন ফেইজের সময় মহাকাল পাল্টে যেতে পারে।

পরবর্তী উক্তিগুলো বিজ্ঞানের এই অভিনব থিওরীর উপর ভিত্তি করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এটা বিশ্বাস করা ঈমানদারদের জন্য মোটেই মূখ্য নয়। কারণ, এটা একটি বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা মাত্র। আল্লাহ পাক সত্যিকার অর্থে কোন্ উপায়ে পুনরুত্থান ঘটাবেন তা কেউ আসলে জানে না। তবে পুনরুত্থান অবশ্যই ঘটবে- কারণ, এ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে আল্লাহর কালাম পবিত্র কুরআন শরীফে। এছাড়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত অনেক হাদীস শরীফেও কিয়ামত দিবস সংঘটিত হওয়া ও এর বিভিন্ন অবস্থার সুস্পষ্ট রিওয়ায়েত এসেছে। সুতরাং এখন যাকিছু বলা হচ্ছে তা

শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আশাকরি পাঠকরা ব্যাপারটিকে স্থূল দৃষ্টিতে দেখবেন এবং যা বলা হচ্ছে তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কিংবা এটাকে আসল সত্য মনে করার প্রয়োজন বোধ করবেন না।

কুরআনের আয়াতমালা থেকে ধারণা করা যায় যে, কিয়ামত দিবসের সময় জগতটি কনট্রাকশন ফেইজে পতিত হবে এবং সময় উল্টোদিকে চলবে। আর সময় উল্টোদিকে চললেই কবর থেকে মানুষের পুনরুত্থান সহজেই ঘটবে। মানুষ এই উল্টোগতির সময়ের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পৃথিবীতে জীবিত থাকাবস্থায় যাকিছু করেছিলো তা করতে থাকবে, কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের নিজস্ব কোন ক্ষমতা থাকবে না। সময়ের জালে আবদ্ধ তার নিজস্ব হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিভিন্ন কার্যাবলী করতে থাকবে, অর্থাৎ কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিতে থাকবে। কারণ সবকিছু সময়ের মধ্যে রেকর্ড করা হয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে এ জগতে আমাদের কৃত কোন ঘটনাই অতীতে বিলীন হয়ে যায় নি। সময়ের জালে সবকিছু আবদ্ধ হয়ে আছে। সময় যখন আবার ফিরে আসবে তখন এসব কার্যাবলী আবার ঘটতে থাকবে। কিন্তু তখন কারো স্বাধীনতা থাকবে না। কৃত কোন লজ্জাষ্কর ঘটনাও তখন আর লুকানো সম্ভব হবে না। কিয়ামতের দিন তাই সবার সামনে এমন কিছু কার্যাবলী মানুষ করবে যার কারণে তাকে লজ্জা পেতে হবে।

আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে ইরশাদ করেন:

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

অর্থাৎ "এই কিতাব (সুরক্ষিত ফলক) তোমাদের বিরুদ্ধে সত্যসহ প্রকাশিত হবে, তোমরা যা করো আমি তা সুরক্ষিত করে রাখছি (সময়ের মধ্যে)" [জাসিয়া (৪৫):২৯]। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

অর্থাৎ "মহাবিশ্ব ও পৃথিবীতে কোন কিছুই গুপ্ত নয়, কিন্তু সবকিছু কিতাবে পরিষ্কারভাবে রক্ষিত (সময়ের মধ্যে)" [নাম্‌ল (২৭):৭৫]।

পৃথিবীর ইতিহাস যখন আবার সময়ের উল্টো গতির কারণে পুনারাবৃত্তি হতে থাকবে তখন একটার পর আরেকটি জাতি কবর থেকে জীবিত হয়ে বেরিয়ে আসবে। সময়ের পাল্টা গতি দ্রুত হবে কি না তা নিশ্চিত নয়। যদি তা দ্রুত হতে থাকে তবে মানুষ সবকিছু খুব দ্রুত করতে থাকবে। কুরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে:

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

অর্থাৎ "ফেরেশতা ও রূহসমূহ আল্লাহর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে (কিয়ামত দিবসে) যা (এ পৃথিবীর) ৫০ হাজার বছরের সমান।" [সূরা মাআরিজ (৭০):৪]।

সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় মানুষের অবস্থান এ গ্রহে যতো দিনই হোক না কেন, কিয়ামত দিবসে ৫০ হাজার বছরের মধ্যে সব মানুষ পুনরুত্থিত হবে ও তাদের কৃত যাবতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি এই ৫০ হাজার বছরের মধ্যেই সম্পাদিত হবে। অবশ্য পাঠকদের একথা জেনে নেওয়া উচিত যে, কিয়ামত দিবস সম্পর্কে এখানে বর্ণিত সবকিছুই বিজ্ঞানের আলোকে ধারণা মাত্র। কিয়ামত দিসব ঠিক এভাবে সময়ের পাল্টা গতির মাধ্যমেই হবে তা নিশ্চিত করে বলার কোন উপায় নেই। এ ব্যাপারে যাবতীয় জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। তিনি যদি চান, অন্য উপায়ে এই কিয়ামত সংঘটিত করতে তবে অবশ্যই তাঁর জন্য তা অত্যন্ত সহজ।

এ প্রসঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানীদের থিওরীর সঙ্গে শেষবিচার দিনের সামঞ্জস্য বর্ণনাই উদ্দেশ্য। এ থেকে মু'মিনদের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং হিদায়াতের রাস্তায় চলার তাওফিক আল্লাহ পাক দান করবেন এটাই কাম্য। এছাড়া অমুসলিমরা হয়তো এটা পাঠ করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করবেন। এসব আশা নিয়েই এই গ্রন্থটি লিখতে মনস্ত করেছি।

কিয়ামত দিবস সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন:

وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

অর্থাৎ "আপনি প্রত্যেক উম্মতকে দেখবেন নতজানু অবস্থায়, প্রত্যেক উম্মতকে তাদের আমলনামা দেখতে বলা হবে- তোমরা যা করতে, অদ্য তোমারদেরকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে।" [জাসিয়া (৪৫): ২৮]

উপর্যুক্ত এ আয়াত থেকেও ধরাণা করা যায় যে, সেদিন হয়তো সময় পাল্টে গিয়ে বিভিন্ন জাতির কৃতকর্ম আবার ঘটতে থাকবে।

সূরা নূরের ২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে:

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থাৎ "সেদিন (কিয়ামত দিবসে) তাদের (মানুষের) জিহ্বা, হাত ও পা তারা যা করতো তাদের বিরুদ্ধে তার সাক্ষ্য দেবে"। [নূর (২৪):২৪]

সেই মহাবিপদের দিন কাফির বেঈমানরা আক্ষেপ করবে। ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا

অর্থাৎ "আমি এ দিবসের জন্য সতর্ক করেছি। সেদিন মানুষ তার নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে অবাক হবে এবং কাফির চিৎকার দিয়ে বলবে, আফসোস! আমি যদি (আজ) ধূলায় পরিণত হয়ে যেতাম!" [নাবা (৭৮): ৪০]। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ

“এবং নবী-রাসূলরা আসবেন নির্দিষ্ট সময়মতো” [মুরসালাত (৭৭):১১]।

হযরত আমর ইবনে আস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন খুতবায় বললেন:

أَلا إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ● أَلا وَإِنَّ الآخِرَةَ أَجَلٌ صَادِقٌ يَقْضِي فِيهَا مَلِكٌ قَادِرٌ ● أَلا وَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِحَذَافِيرِهِ فِي الْجَنَّةِ ● أَلا وَإِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ بِحَذَافِيرِهِ فِي النَّارِ ● أَلا فَاعْمَلُوا وَأَنْتُمْ مِنَ اللهِ عَلَى حَذَرٍ ● وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَعْرُوضُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ ● {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}

-“শুনে রাখ, দুনিয়া একটি অস্থায়ী, সাময়িক, উপস্থিত ও নগদ ব্যাপার। এতে প্রত্যেক সৎ ও অসতের অংশ রয়েছে এবং প্রত্যেকেই এর ফল ভোগ করে। কিন্তু বিশ্বাস কর, পরকাল নির্ধারিত সময়েই আসবে। এটা একটা অটল সত্য। সর্বশক্তিমান মহান প্রভু পরকালেই ফায়সালা করবেন। স্মরণ রেখো, যাবতীয় মঙ্গল সুখ-শান্তি তার সমস্ত প্রকারসহ জান্নাতে রয়েছে এবং যাবতীয় দুঃখ-যন্ত্রণা, অনিষ্ট তার সমস্ত প্রকারসহ দোযখে রয়েছে। সুতরাং সাবধান! যা কিছু কর, আল্লাহ তা’আলাকে ভয় করে কর। বিশ্বাস কর, তোমরা স্ব-স্ব কর্মসহ আল্লাহ তা’আলার দরবারে পেশ হবে। {“যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ কোন সৎকর্ম করবে, সে তা-ও দেখতে পাবে এবং যে অণু পরিমাণ কোন মন্দ কাজ করবে সে তা-ও দেখতে পাবে” (সূরা যালযালাহ (৯৯):৭-৮)}” [মুসনাদে ইমাম শাফিঈ (রাহ:), মা’আরিফুল হাদীস]।

এসব আয়াত ও হাদীস শরীফ থেকে বুঝা যায় যে, কিয়ামত দিবসও সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিয়ামত দিবসের স্থায়িত্বকাল (পঞ্চাশ হাজার বছর), রাসূলদের নির্দিষ্ট সময়ে আগমন প্রভৃতি সময়ের সঙ্গেই জড়িত। অপর একটি চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হলো এই: আমরা অহরহ শোনে থাকি, কাল-কিয়ামত বা কিয়ামত নিকটবর্তী প্রভৃতি কথা। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কাল-কিয়ামত বা কিয়ামত নিকটবর্তী বলা হলো অথচ ইসলামের আগমনের ১৪০০ বছর পার হয়ে গেছে। তাহলে এসব কথার অর্থ কি দাঁড়ায়? এ প্রশ্নের জবাবও সময়ের কারসাজির মধ্যে লুকানো আছে।

আমাদের জীবনে অনেকেই জানি সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় সময়ের কোন ধারণা বা প্রতিক্রিয়া আমাদের মোটেই অনুভূত হয় না। সুতরাং মৃত্যুর পর যারা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত (সে দিবস কোটি বা কোটি কোটি বছর পরেই হোক কিংবা একদিন পরেই হোক) কেউ যদি অজ্ঞাত অবস্থায় থাকে এবং এরপর (অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবসে) আবার জ্ঞান ফিরে পায় তবে সে কতকাল অজ্ঞান ছিলো তা কি কখনো জানতে পারবে? সে কি ভাববে না, সে কাল মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে আবার আজ জেগে উঠেছে। সুতরাং এ দিক থেকে চিন্তা করলে, কিয়ামত কি আগামীকাল নয়, অর্থাৎ মৃত্যুর পরেই সংগঠিত হতে যাচ্ছে না? কিয়ামত নিকটবর্তী এই অর্থেই বুঝতে হবে। অবশ্য আলমে বরযখ বা কবরের জিন্দেগী নামক একটি সময় আছে। এটা কিন্তু কবরে যাওয়ার পরও যাদের চেতনা বা কন্সিয়াসনেস আল্লাহর হুকুমে শাস্তির উদ্দেশ্যে কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক বহাল থাকবে, তাদের ক্ষেত্রেই সত্য।

যারা এই কন্সিয়াসনেস থেকে সম্পূর্ণ গাফিল অর্থাৎ অজ্ঞাত থাকবে তাদের পক্ষে সময় অতিবাহিত হওয়ার অনুভূতি কোন ক্রমেই থাকবে না, তারা মনে করবে কাল মারা গেলাম আর আজ কিয়ামতের ময়দানে সমবেত হচ্ছি। এ হচ্ছে সময় ও আমাদের কন্সিয়াসনেস তথা চেতনার মধ্যে সম্পর্ক। সুতরাং মু'মিনদের চিন্তা করা উচিত মৃত্যুর পরই কিয়ামত দিবসের মহাবিপদ তাদের সম্মুখে উপস্থিত হচ্ছে। এ মহাবিপদের দিন মোটেই দূরে নয়- অতি কাছে। বিষয়টা ভালো করে অনুধাবন করা একান্ত জরুরী।

আগেই বলেছি পবিত্র কুরআন শরীফে বিজ্ঞানবিষয়ক প্রায় ৮০০ আয়াত আছে। এই গ্রন্থে এসব প্রতিটি আয়াতে করীমের বর্ণনা আদৌ সম্ভব নয় এবং প্রয়োজনও আছে বলে মনে করি না। উপরে বর্ণিত ক'টি আয়াত শরীফ থেকেই মূল বক্তব্যটা স্পষ্ট হয়েছে যে, কুরআন একটি বিজ্ঞানসম্মত ঐশীবাণী। এর মধ্যে বর্ণিত বিভিন্ন আয়াত থেকে মানুষ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত জ্ঞান আহরণ করে যাবে এবং প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সত্য কোন তথ্যের সঙ্গে এতে কোন অসামঞ্জস্যতা কিংবা সংঘাত খুঁজে পাওয়া যাবে না। দীর্ঘকাল ইসলামবিরোধীরা এই সংঘাত বের করার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। এখন তারা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কুরআন যে মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে সমগ্র মানবজাতির জন্য হিদায়াতের বাণী তা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে কুরআন শরীফের আরও কিছু বৈজ্ঞানিক আয়াতমালা এসেছে। যাবতীয় ফিজিক্যাল প্রসেস যে মূলত আল্লাহর গুণাবলীর বিকাশ, সেই কথাটি নিয়েই আমরা এখন আলোচনা করবো। পাঠকরা লক্ষ্য করবেন, দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত বিজ্ঞানের কিছু তথ্যাবলী এখানে পুনরুল্লিখিত হয়েছে। বিষয়বস্তু বর্ণনায় এটা জরুরী মনে করেই তা করা হয়েছে।

"মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবা-রাতের আবর্তনে বোধশক্তিসম্পন্ন (গবেষক, চিন্তাশীল, বিজ্ঞানী) ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" [সূরা আলে ইমরানঃ ১৯০]

পরিচ্ছেদ ৪

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্বজগতে আল্লাহর গুণাবলীর বিকাশ

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন;

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-"আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।" [ফাতিহা (১):১]
অর্থাৎ, "যাবতীয় প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য"।

পবিত্র এ আয়াতে আল্লাহর গুণবাচক একটি নাম রব্ব বা প্রতিপালক শব্দটির মাধ্যমে আল্লাহর অসংখ্য গুণাবলীর একটি মাত্র উল্লেখিত হয়েছে। তবে তাঁর এ গুণটি বিশ্বজগতে সর্বাপেক্ষা ব্যাপ্ত। প্রতিপালন অর্থ হচ্ছে, যাবতীয় বস্তুর তত্বাবধান। বস্তু জগত ও প্রাণীজগতকে পালন করাসহ প্রতিটি অণু-পরমাণুর অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য আল্লাহর এ গুণটি কর্মশীল আছে। অসীম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ পাকের গুণাবলী সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পবিত্র কালামে পাকে তাঁর অসংখ্য গুণাবলীর মধ্যে ৯৯টি উত্তম গুণের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এসব পবিত্র নামের একটিরও তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়ে বলা আমার জন্য কখনো সম্ভব হবে না। তথাপি আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে উপর্যুক্ত রব্ব গুণবাচক নামটির উপর কিছুটা আলোকপাত করার প্রয়োজন মনে করছি।

একথা আগেই বলে রাখা প্রয়োজন যে, বিজ্ঞান এ পর্যন্ত যেসব তথ্যাদি আবিষ্কার করেছে তা মোটেই নির্ভুল মহাসত্য নয়। এ কথাটি আজ স্বয়ং বিজ্ঞানীরাই স্বীকার করে নিয়েছেন। বিভিন্ন দার্শনিক ও তত্ত্ববিদরা যেরূপ ভিন্ন ধরনের মতবাদ তৈরী

করে থাকেন, বিজ্ঞানও সেরূপ অনেক মতবাদ তৈরী করেছে। এর মধ্যে কিছু আছে হাইপোথেসিস, কিছু আছে থিওরী আর কিছু আছে পরীক্ষিত সত্য তথ্যাবলী বা ফ্যাক্ট। হাইপোথিসিস পর্যায় হচ্ছে বিজ্ঞানীর এ্যাডুকেইটেড গ্যাছ বা **'সুচিন্তিত ধারণা'**। থিওরীর পর্যায় হলো গাণিতিক মানদণ্ডে উপস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তথ্যনির্ভর মতবাদ। এছাড়া কিছু পরীক্ষিত সত্য তথ্যাবলী প্রামাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেগুলো সর্বমহলে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। শেষোক্তটিই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক ফ্যাক্ট বা সত্য।

এটুকু বলার পর আমি এবার বিজ্ঞানের বিভিন্ন উপমা দিয়ে আল্লাহর এ সৃষ্ট জগতে রব্বুবিয়তের প্রক্রিয়া কিভাবে সক্রিয় আছে তা তুলে ধরছি। পাঠকরা এ থেকে সামান্যতম উপকৃত হলেও আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে মনে করি।

রব্বুবিয়তের স্বরূপ

আল্লাহ পাকের রব্বুবিয়ত বা প্রতিপালনকারিতার স্বরূপ অনেক ধরনের। প্রতিটি বস্তু ও প্রাণীজগতের প্রতিটি জীবীকে বিশেষ আইন ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি অস্তিত্বদান করেন। কালের আবর্তে সবকিছু তাদের নির্দিষ্ট সময় অস্তিত্বশীল থেকে আবার ক্ষয় হয়, ধ্বংস হয়। জগত সৃষ্টির শুরু থেকেই এ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। এতে কোন হেরফের নেই। অর্থাৎ বস্তুজগতের প্রতিটি জড়-পদার্থ এবং অণু-পরমাণু রব্ব-প্রদত্ত কয়েকটি মৌলিক আইনের আওতাভূক্ত থেকে অস্তিত্ব বজায় রেখে আছে। মূলতঃ আল্লাহর দেওয়া রব্বুবিয়তের আইন ও তার গণ্ডিসীমার বাইরে কোন কিছুই যেতে পারে না। এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এক্ষেত্রে প্রাণীজগতের বেলা আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা হেরফের দেখা যায়, কিন্তু তা-ও আল্লাহর জ্ঞান ও রব্বুবিয়তের সীমানা বহির্ভূত নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ যখন আল্লাহর অপছন্দ কিছু করে, তখন এটাকে আল্লাহর আইন ভঙ্গ করা বলা যায়, তবে এ কার্য করার যে ক্ষমতা মানুষের মধ্যে উৎপন্ন হয় তা-ও কিন্তু আল্লাহর রব্বুবিয়তের (প্রদত্ত শক্তির) আওতাভূক্ত।

মনে করুন কেউ অন্যায়ভাবে কোন লোককে হত্যা করলো- এ কাজটি আল্লাহর অপছন্দ এবং দুনিয়া আখিরাতে এই পাপী ব্যক্তি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু মানুষ মারার ক্ষমতা আল্লাহ তার প্রতিপালনের আওতায় তাকে দিয়েছেন। যদি সে ক্ষমতা দেওয়া না হতো, তবে অবশ্যই সে মানুষ মারতে পারতো না। এ উপমা থেকে ভালো মন্দ সবকিছু যে আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে আছে এবং তাঁর হুকুম ছাড়া সংঘটিত হয় না, এ কথাটি বুঝতেও সুবিধে হয়।

মোটকথা রব্বুবিয়তের আইনের বাইরে কোন কিছুই নেই। সবকিছু এর ভেতরে অবস্থান করে। আল্লাহর পবিত্র রব্ব নামের গুণাবলীর মধ্যেই প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্ব বজায় আছে ও প্রতিটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে।

বস্তুজগতে রব্ব গুণের স্বরূপ

সমগ্র বস্তুজগত নিয়ে বিজ্ঞানের গবেষণা। জড়ের রং, রূপ, ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া, ফিজিক্যাল নেচার, রসায়নিক প্রক্রিয়া, অস্তিত্ব ও স্থিতিশীলতার কারণ, গুপ্ত ফোর্স প্রভৃতি বিষয়বস্তু সিস্টেমেটিক, গাণিতিক ও পরীক্ষালব্ধ পদ্ধতিতে জানার নামই হচ্ছে বিজ্ঞান। এককথায় আল্লাহর রব্বুবিয়তের স্বরূপ উন্মোচন করা এই জ্ঞানের শাখার কার্যকলাপ। এ জ্ঞানের সন্ধান আজকের ব্যাপার নয়। মানবসভ্যতার আদিকাল থেকেই অনুসন্ধিৎসু সৃষ্টির সেরা মানবজাতি এ জ্ঞানার্জনে ব্রত আছে। স্বয়ং রব্ব এ অনুসন্ধানে লেগে যাওয়ার জন্য মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

"মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবা-রাতের আবর্তনে বোধশক্তিসম্পন্ন (গবেষক, চিন্তাশীল, বিজ্ঞানী) ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" [সূরা আলে-ইমরান (৩): ১৯০]

পবিত্র কালামে এরূপ আরোও বহু আয়াতমালা আছে যেগুলো মানুষকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জগত নিয়ে গবেষণা করতে উৎসাহিত করে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এব্যাপারে মু'মিনদের তাগিদ দিয়েছেন। জ্ঞানান্বেষায় লেগে যাওয়ার জন্য উপদেশ করেছেন। আর অবশ্যই ঈমান নিয়ে কেউ যদি এ গবেষণায় অগ্রসর হয়, তবে সে আল্লাহর পরিচিতি অর্জন করতে পারবে। আর এ পরিচিতির মাধ্যমেই মানুষ প্রকৃত ইনসানিয়্যাত হাসিল করতে পারে। আজ আমাদের বড় ভাগ্য যে, বিজ্ঞানের আবিষ্কার থেকে আমরা অতি সহজেই আল্লাহর রব্বুবিয়তের স্বরূপ জানতে পারি। এবার পাঠকদের সুবিধার্থে বর্তমান বিজ্ঞানের কিছু তথ্যাবলী পুনরুল্লেখ করছি। নিম্নোল্লিখিত প্রতিটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আল্লাহর রব্ব গুণের বিকাশের স্বরূপ উন্মোচিত করেছে। একটু চিন্তা করলেই এ সত্য ধরা পড়ে।

বিজ্ঞানের আলোকে জগত পরিচালনার স্বরূপ

বিজ্ঞান আজ আমাদেরকে জগতের মৌলিক পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু চিত্তাকর্ষক তথ্য দিয়েছে। জগতের যাবতীয় বস্তুর গঠনপ্রণালী, ফিজিক্যাল শক্তি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রভৃতির ক্ষেত্রে এসব তথ্যাবলী একজন ঈমানদারকে অবাক করবে বৈকি। তবে এতে তার ঈমানী শক্তি যে দৃঢ়তর হবে সে কথা নিশ্চিত।

(ক) বস্তুর গঠনপ্রণালী

বস্তুজগৎ মূলত কিছু মৌলিক পার্টিকেল বা কণা থেকে সৃষ্ট। যে কোন বস্তুকে ভাগ করতে করতে এমন এক পর্যায়ে আমরা এসে যাবো, যখন আর ভাগ করাও সম্ভব হবে না। এ অবস্থাকে কণা বা পার্টিকেল এর পর্যায় বলা হয়। আর একাধিক পার্টিকেলের সমন্বয়ে এক একটি অণু বা এটম সৃষ্টি হয়েছে। এটম বস্তুর অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ। নগ্ন চোখে এটমকে কেউ দেখতে পারে না। অত্যন্ত শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ দিয়ে এগুলোকে দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত ইলেকট্রন

মাইক্রোস্কোপ নামক একপ্রকার শক্তিশালী অণুবিক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এটমকে দেখা সম্ভব।

এটমের গঠনপ্রণালীর উপর নির্ভর করে, যে কোনো বস্তুর একক আলাদা পরিচিতি। এটমের মধ্যে সাধারণত দু'টি ভিন্ন স্তর বিরাজ করে। এর একটি হচ্ছে বাইরের ও অপরটি ভেতরের। বাইরের স্তরে এক বা একাধিক ইলেকট্রন নামক কণা ভেতরের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রকে সর্বদা প্রদক্ষিণ করে। এ অবস্থা সূর্যকে যেরূপ গ্রহ-উপগ্রহগুলো প্রদক্ষিণ করে ঠিক তদ্রূপ।

কেন্দ্রে বা নিউক্লিয়াসে সাধারণত দু'টি ভিন্ন কণা আছে, এর একটি হলো প্রটোন আর অপরটি নিউট্রোন। এটমের ভেতর ক'টি প্রোটন, নিউট্রন আছে এবং বাইরে ক'টি ইলেকট্রন আছে, এথেকেই ভিন্ন পদার্থ হিসেবে বস্তু অস্তিত্ব বজায় রাখে। যেমন জগতের সর্বাপেক্ষা বেশী ও অত্যন্ত সহজভাবে অস্তিত্বশীল মৌলিক পদার্থ বা ইলেমেন্ট হচ্ছে হাইড্রোজেন। এ হাইড্রোজেন এটমের নিউক্লিয়াসে দু'টি মাত্র কণা আছে, এর একটি নিউট্রোন ও অপরটি প্রটোন। এর বাইরে একটিমাত্র ইলেকট্রন আছে যা কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করছে। পরবর্তী পদার্থ হিলিয়ামের কেন্দ্রে আছে দুটি প্রটোন ও দুটি নিউট্রোন এবং বাইরে আছে দুটি ইলেকট্রন। এরূপ ভিন্ন ইলেমেন্টের এটমগুলোতে ভিন্ন সংখ্যক ইলেকট্রন, প্রটোন ও নিউট্রন আছে। বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত ১১২টি ভিন্ন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেছেন। এর মধ্যে ১০৯টি পদার্থের নাম দেওয়া হয়েছে। হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, লিথিয়াম প্রভৃতি হচ্ছে স্বভাবের মৌলিক পদার্থসমূহ। কোন মৌলিক পদার্থ আবার একাধিক এটমের মাধ্যমে গঠিত। কয়েকটি এটম একত্রে কোন বিশেষ পদ্ধতিতে যুক্ত হয়ে বণ্ড তৈরী করে পদার্থ সৃষ্ট হয়। এ অবস্থাকে মলিকিউল বলে।

একাধিক আলাদা পদার্থের মলিকিউল একত্রে থেকে জগতের অন্যান্য কোটি কোটি ধরনের বস্তু সৃষ্ট হয়েছে। মৌলিক পদার্থ ছাড়া এসব ভিন্ন বস্তুকে সাধারণত কম্পাউন্ড বা মিশ্র বস্তু বলা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে বস্তুর স্বাদ, গন্ধ, রং এবং অন্যান্য গুণাবলী এটমিক ও মলিকিউলার স্তরেই চিহ্নিত ও অর্জিত হয়। যেমন পানির কথা বলা যায়। পানির স্বাদ, রং ও গন্ধ যেরূপ আছে সেরূপ হয় এজন্য

যে, এটি (মলিকিউলার স্তরে) দুটি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন এটমের তৈরী মলিকিউল থেকে সৃষ্ট। এ মলিকিউলটি পানির গুণাবলী ছাড়া অন্য কোন গুণাবলী বহন করতে পারে না। সুতরাং এ মলিকিউলটি সর্বদাই পানি থাকবে। মোটকথা মলিকিউলার স্তরে প্রতিটি বস্তুই একটি কেমিক্যাল ফর্মুলা দ্বারা সৃষ্ট। এ ফর্মুলা বলে দেবে বস্তুটি কিসব মৌলিক পদার্থ দিয়ে গঠিত। পানির ক্ষেত্রে এ ফর্মুলা হচ্ছে এইচ$_2$ঝিরো (H_2O)। এর অর্থ হলোঃ দুটি হাইড্রোজেন এটম ও একটি অক্সিজেন এটম। সুতরাং বিজ্ঞানীরা যে কোন বস্তুর কেমিক্যাল ফর্মুলা দ্বারা এটা কোন্ কোন্ মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে, তা সহজেই বুঝতে পারেন।

জগতের সব বস্তুর আরোও কিছু মৌলিক গুণাবলী আছে। যে কোন বস্তু সাধারণত তিনটি অবস্থার একটি হয়ে থাকে। এগুলো হলো, তরল, কঠিন ও গ্যাস। অন্য আরেকটি অবস্থা আছে যাকে প্লাজমা বলে। এ অবস্থা পৃথিবীর বুকে সাধারণত পাওয়া যায় না। সাধারণ এ তিনটি অবস্থার দৃষ্টান্ত পানি দিয়ে দেওয়া যায়ঃ পানির তাপমাত্রা যখন ঝিরো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থেকেও নিচে নেমে আসে তখন তা কঠিন পদার্থ বা বরফ হয়ে যায়। ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের নিচে এবং ঝিরো ডিগ্রীর উপরে হলে তরল অবস্থায় থাকে এবং ১০০ ডিগ্রীর উপরে হলে বাষ্প বা গ্যাসে পরিণত হয়। সুতরাং বস্তু তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে, এ তিন অবস্থার যে কোন একটি অবস্থা ধারণ করে অস্তিত্ব বজায় রাখে।

অতি সংক্ষেপে বস্তুর অবস্থা, স্থিতিশীলতা, গঠনপ্রণালী ও স্বরূপ এখানে আবারও বর্ণিত হলো (বিস্তারিত জানার জন্য দ্বিতীয় খণ্ড দেখুন)। এ ব্যাপারে আর বলার প্রয়োজন নেই। তবে এথেকেই আল্লাহর রব্বুবিয়তের একটি দিক গবেষণা করা যায়। উপরে উল্লেখিত তথ্যগুলোর সবক'টিই আল্লাহর দান বা গুণাবলীর মাধ্যমে জগতে অস্তিত্বশীল হয়েছে। এর একটিও কোন মানুষ বা অন্যকিছু দ্বারা সৃষ্ট নয়। মানুষ পরীক্ষা ও গবেষণা দ্বারা এ তথ্যগুলো আবিষ্কার করেছে মাত্র।

(খ) বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াশীল মৌলিক শক্তিবলী

জগতের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে কিছু মৌলিক শক্তি ও গুণাবলী নিহিত আছে। এগুলো অণু-পরমাণু থেকে বিশ্বব্যাপী সর্বত্র ক্রিয়াশীল আছে। আল্লাহর রব্ব নামের বিকাশে এসব শক্তি বা মৌলিক আইন বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার করে।

এ পর্যন্ত বিজ্ঞান চারটি ফান্ডামেন্ট্যাল ফোর্সেস অব নেচার বা স্বভাবের মৌলিক শক্তিবলী আবিষ্কার করেছে। এ চারটি শক্তির আওতাভূক্ত থেকে যাবতীয় ফিজিক্যাল ক্রিয়া সংঘটিত হয়। ফোর্সগুলোর এক একটি আলাদা গুণ আছে।

আমি এবার এ চারটি শক্তি বস্তুজগতে কিভাবে প্রভাব ফেলে তা সহজ ভাষায় উপস্থাপন করার চেষ্টা চালাচ্ছি (বিস্তারিত দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে)। আল্লাহর রব্বুবিয়তের স্বরূপ বুঝতে গেলে এ ফোর্সগুলো সম্পর্কে অন্তত প্রাথমিক জ্ঞান থাকা অপরিহার্য তাই এগুলো নিয়ে আরেকবার কিছু আলোচনা জরুরী।

(১) গ্রাভিটি বা মহাকর্ষ: বিশ্বজগতে মহাকর্ষ হচ্ছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটি মৌলিক শক্তি। এ শক্তিটি প্রতিটি অণুকণা থেকে কোটি কোটি মাইল ও আলোক বৎসর দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থিত প্রতিটি ছোট-বড় বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল আছে। এটা এমন এক শক্তি যা দুটি বস্তুর মধ্যস্থিত আলো-বাতাসহীন শূন্যস্থানের উপরও সক্রিয় আছে। অর্থাৎ একটি তারা থেকে আরেকটি তারার উপর এ শক্তি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, যদিও এ দুয়ের মধ্যস্থিত দূরত্বে সম্পূর্ণ শূন্যস্থান (কোন বস্তু বা আলো-বাতাস নেই) বিরাজ করে। এককথায়, মহাকর্ষ জগতের সর্বত্র বিরাজমান- বস্তু এবং শূন্যস্থানসহ। মহাকর্ষের ফলে আমরা পৃথিবীতে বিচরণ করতে পারি, উপরের দিকে ঢিল ছুঁড়লে তা আবার মাটিতে পতিত হয়, বৈশাখে ঝড়ের ঝাপটে আম গাছ থেকে পাকা আম মাটিতে পড়ে, আকাশ থেকে বৃষ্টি নেমে আসে, সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, সৌরজগৎ ও বিশ্বজগত যেরূপ অস্তিত্ব বজায় রেখে মহাকাশে বিচরণ করছে সেরূপ আছে।

মহাকর্ষের একটি প্রধান গুণ হচ্ছে, এটা নিজের দিকে বস্তুকে টেনে আনে। দুটি বস্তু তা এটমিক পর্যায়ে হোক আর গ্রহ-উপগ্রহের ক্ষেত্রে হোক, তারা বা তারাজগতই হোক, একে অন্যের দিকে আকর্ষিত হয় মহাকর্ষের প্রভাবে। আমরা সবাই এবং সবকিছু পৃথিবীর কেন্দ্র বা সেন্টারের দিকে আকর্ষিত হচ্ছি। আপনি যদি পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত একটা সুদীর্ঘ গর্ত খুঁড়ে তাতে জাম্প দেন, তবে অবশ্যই আপনি কয়েক মিনিটের মধ্যে কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে যাবেন।

মহাকর্ষ সত্যিই আল্লাহর রব্বুবিয়তের আওতাভূক্ত একটি অপূর্ব সৃষ্টিকৌশল। এ শক্তির প্রভাবে বস্তুর উপর পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি মাত্র পথ আছে। আর তা হলো, ঘূর্ণন। এটমের উপর ইলেকট্রন যাতে পড়ে না যায়, এজন্য সে নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে ঘুরতে বা প্রদক্ষিণ করতে থাকে। পৃথিবীর উপর চন্দ্র যাতে পড়ে না যায় এজন্য সে-ও একটি নির্দিষ্ট গতিতে পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরছে। মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহও এভাবে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে সেখানে অবস্থান করতে পারে। পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহগুলোও প্রদক্ষিণ করে সূর্যের উপর পড়ে, পুড়ে ছাই হওয়া থেকে রক্ষা পাচ্ছে। পুরো সৌরজগত- অর্থাৎ সূর্য তার পরিবার-পরিবর্গসহও আমাদের গ্যালাক্সির চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করছে।

ঘূর্ণন বা প্রদক্ষিণের মাধ্যমে বেঁচে থাকার পেছনে কোন্ রহস্য লুকিয়ে আছে? বিজ্ঞানীরা এ রহস্যের নামকরণ করেছেন, আঙ্গুলার মমেন্টাম বা কৌণিক গতিশীলতা। এ ঘূর্ণনের মাধ্যমে বস্তুর ভেতর একটি শক্তি সঞ্চয়িত হয়। এ শক্তির ফলে বস্তুটি বাইরের দিকে ছুটে যেতে নিজের মধ্যে গতিশীলতা সৃষ্টি করে। এ গতির মাত্রা এবং মহাকর্ষের মধ্যে একটা ব্যালান্স তৈরী হয়। এর ফলে বস্তুটি পড়ে যায় না ঠিক, কিন্তু ছুটে যেতেও পারে না। সুতরাং ঘুরতেই থাকে। চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহর কী অপূর্ব সৃষ্টিকৌশল এখানে কাজ করছে! অণু-কণা থেকে জগতের সবকিছু ঘূর্ণমান-গতিশীল কেন, তা অবশ্যই এবার আপনারা বুঝতে পারছেন। আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে বলেছেন:

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

অর্থাৎ "চন্দ্রকে ধরতে পারে না সূর্য, রাতও নহে দিবসের অগ্রগামী; প্রত্যেকেই (মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে) কক্ষপথে সন্তরণশীল"। [সূরা ইয়া-সীন (৩৬):৪০]

স্বভাবের মৌলিক এ শক্তিটি কোন মানুষ বা জ্বীন-পরীর সৃষ্ট নয়। এটা স্বভাবও সৃষ্টি করে নি। আসলে স্বভাব কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। প্রকৃতি আল্লাহর রব্ব গুণের বিকাশ মাত্র। আল্লাহ পাক সকল বস্তু সৃষ্টি করে কিছু মৌলিক আইন-কানুন দ্বারা এগুলোকে অস্তিত্ব দান করেছেন। এসব আইনের বাইরে বস্তুজগত অকেজো, মূলতঃ স্থিতিহীন। আল্লাহ সব বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন, পালন করছেন, অস্তিত্ব দান করেছেন। এগুলো এই প্রতিপালনের আওতায় থেকেই আবার অস্তিত্বহীন হবে, ধ্বংস হবে। পাঠকরা শীঘ্রই বস্তু ধ্বংসের কারণ ও স্বরূপ বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

(২) ইলেকট্রমেগনেটিক ফোর্স বা ইলেকট্রচুম্বকীয় শক্তি: এ শক্তিটিও বিশ্বজগতের সর্বত্র ক্রিয়াশীল আছে। প্রতিটি বস্তুতে ইলেকট্রিক ও চুম্বকীয় শক্তি ক্রিয়াশীল হতে পারে। কেমিস্ট্রি ও বায়েলোজলিতে যেসব প্রতিক্রিয়া বা রিয়েকশন হয় তা এ শক্তির ফলেই হয়। ইলেকট্রমেগনেটিক রেডিয়েশন যেমন টিভি, রেডিও, এক্সরে, ইনফ্রারেড, আলট্রাভাইলোট প্রভৃতি সিগনালও এ শক্তির ফলে সংঘটিত হয়। আলোও এ শক্তির ফলাফল। বৈদ্যুতিক ও চুম্বকীয় ক্রিয়ার মাধ্যমে এনার্জি, বিকিরণ (রেডিয়েশন) ও আলো নির্গত হয়ে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারে। যদিও মহাকর্ষ নিয়ে আইজাক নিউটন চারশ বছর পূর্বে গভীর গবেষণা করেছিলেন, কিন্তু ইলেকট্রমেগনেটিক শক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র শতাধিক বছর আগে।

(৩) স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স বা সবল আনবিক শক্তি: প্রাকৃতিক আরেকটি মৌলিক শক্তি আছে যাকে সবল আনবিক শক্তি বা স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স বলা হয়। এ শক্তিটি প্রতিটি বস্তুতে আনবিক ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল আছে। প্রতিটি এটমের কেন্দ্রকে এ শক্তিই বেধে রাখে। কেন্দ্রের মধ্যে যে নিউট্রন ও প্রটোন নামক দুটি কণা আছে, এগুলো এ শক্তি থাকার ফলে একে অন্যকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করে রাখে। আনবিক বিস্ফোরণের মাধ্যমে যে বিশাল এনার্জি বা উদ্যম বেরিয়ে এসে পার্শ্ববর্তী এলাকায় ধ্বংসলীলা ঘটায়, তা এই প্রভাবশালী আনবিক শক্তির ফলেই হয়। মানুষ এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে আনবিক চুল্লীর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনও করছে। নিউক্লিয়ার এনার্জির মূলে এ মৌলিক শক্তিই ক্রিয়াশীল আছে।

আল্লাহ পাকের রব্বুবিয়তের কী অপূর্ব আরেক নিদর্শন এ শক্তিটি। এ শক্তির ফলে যেমনি বস্তুর অস্তিত্ব রক্ষা পাচ্ছে, তেমনি এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষের বিরাট উপকার হচ্ছে। তবে আমাদের মানবীয় লোভ, হিংসা, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে এ বিরাট শক্তিটি ব্যবহারে উন্মাদ কিছু বিজ্ঞানীরা এটম, হাইড্রোজেন ও নিউট্রন বোমার মত জঘন্য ধ্বংসশীল অস্ত্র বানিয়েছেন। এর ফলে এ পৃথিবীর নিরাপত্তা হয়ে উঠেছে ভীষণভাবে অনিশ্চিত। এটা সত্যিই প্রযুক্তি বিজ্ঞানের একটি জঘন্য কাজ, যার জন্য ভবিষ্যতের ইতিহাসবিদরা ধিক্কার দেবেন, একথা নিশ্চিত। অথচ আল্লাহ প্রদত্ত এ শক্তিটি জগতের জন্য অপরিহার্য। এ শক্তির ফলেই সূর্য ও তারাগুলো জ্বলন্ত আছে। সূর্যের কেন্দ্রে আনবিক স্কেলে বিস্ফোরণ হচ্ছে। সূর্যের কেন্দ্র একটি জ্যান্ত হাইড্রোজেন বোমা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভীষণ তাপমাত্রার ফলে হাইড্রোজেন এটমের নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং এ রিয়েকশনের ফলস্বরূপ সূর্য আলো ও তাপসহ অনেক ধরনের এনার্জি চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ এনার্জি থেকে পৃথিবী ও এর অধিবাসীরা উপকৃত হচ্ছে। সূর্যের তাপ ও আলো ছাড়া এ গ্রহে কোন প্রাণী জ্যান্ত থাকতে পারতো না।

পাঠকরা একটু ভেবে দেখুন। আল্লাহর রব্ব নামের গুণাবলীর বিকাশ কিভাবে জগতে প্রকাশ হচ্ছে, তা নীরবে একটিবার চিন্তা করে দেখুন। মহাকর্ষের মাধ্যমে এই সৌরগজতসহ সমগ্র বিশ্বজগত একে অন্যের উপর ভিত্তি করে ঘুর্ণমান অবস্থায় থেকে, শৃংখলা বজায় রেখে চলছে। বৈদ্যুতিক-চুম্বকীয় শক্তির ফলে

বস্তুতে সৃষ্ট কিছু এনার্জি উৎপন্ন হয়ে জগতকে আলোকিত করছে ও শূন্যস্থানের উপর কোটি কোটি আলোক বৎসর পেরিয়ে চলে যাচ্ছে এক্স-রে, আলোক, লাল-তরঙ্গ প্রভৃতি এনার্জি। প্রভাবশালী আনবিক শক্তির ফলে সূর্যসহ কোটি কোটি তারারা জ্বলন্ত আছে। এটা আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি-কৌশল নয় কি? সন্দেহবাদী ও অবিশ্বাসী নাস্তিক-বেঈমানরা কী করে বলে যে, আল্লাহ ও ধর্ম মানুষের ধারণা মাত্র! এরা কি এসব দেখে না? এগুলো তো আধ্যাত্মিক ব্যাপার নয় যে, দিব্যদৃষ্টি অর্জিত না হলে বুঝা যাবে না। জগতের মধ্যে রব্বুবিয়তের অসংখ্য প্রমাণ ও কার্যাবলী স্বচক্ষে দেখে ও জেনে তারা কিভাবে ধর্মহারা, প্রভু-বিরুদ্ধ হতে পারে তা আমি অনেক ভেবেও বুঝতে পারিনি। এরা কি ভাবে না? জগত নিয়ে সামান্যতম গবেষণাও করে না? আশ্চর্য মানুষ এসব অবিশ্বাসী ও সন্দেহবাদীরা!

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। যিনি অনুগ্রহ করে আমাদেরকে সন্দেহবাদী ও বেঈমানদের দলে জড়িত করেন নি। আল্লাহর দরবারে কোটি কোটি শুকরিয়া।

(৪) দুর্বল আনবিক শক্তি ঃ বস্তু জগতে আরো একটি মৌলিক শক্তি ক্রিয়াশীল আছে। এ শক্তির বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স বা দুর্বল আনবিক শক্তি। অণু পরমাণুর স্কেলে এ শক্তিটি প্রভাবশালী।

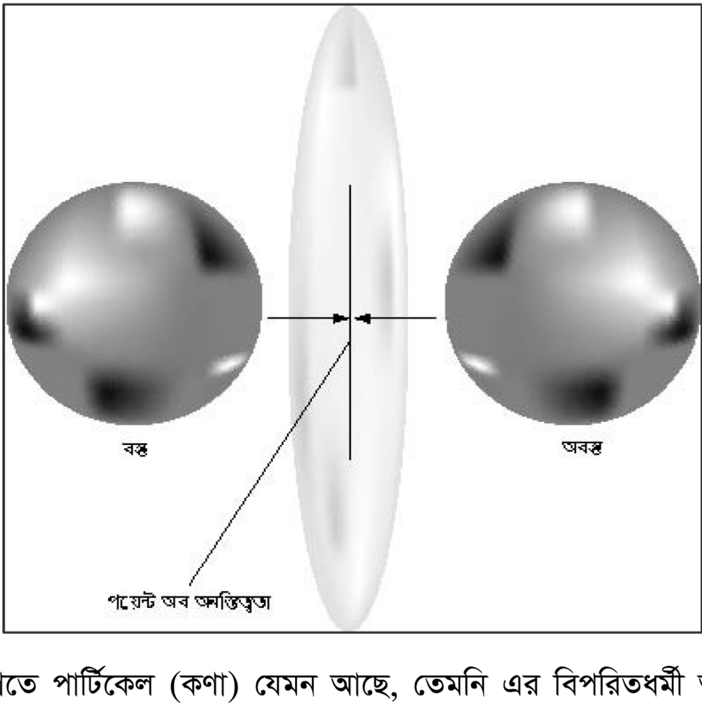
মূলত বস্তুর ক্ষয় হওয়ার জন্য এ শক্তিটি দায়ী। এটমের কেন্দ্রে যে নিউট্রন নামে একটি পর্টিকেল আছে, এটি দুর্বল আনবিক শক্তির প্রভাবে ক্ষয় হয়ে যায়। এ শক্তি, স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স ও বৈদ্যুতিক-আনবিক শক্তির সমন্বয়ে কিছু এনার্জির সৃষ্টি হয়। এসব এনার্জিকে রেডিওএ্যাকটিভিটি বা তেজষ্ক্রিয়তা বলে।

পাঠকরা লক্ষ করুন, উপরে বর্ণিত মৌলিক এই চারটি ফোর্সের আইন বহির্ভূত কোন বস্তুই এ জগতে নেই। সবগুলো এসব আইনের আওতাভূক্ত। বস্তু জগত এদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এখানে আল্লাহর পরিচালন ক্ষমতার স্বরূপ কী সুন্দরভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞান এসব মৌলিক শক্তিবলী আবিষ্কার করে জড়জগতে রব্বুবিয়তের ক্রিয়া বলতে কি বুঝায় তা পরিষ্কার করে দিয়েছে।

(গ) কিভাবে প্রতিটি অণুকণা ক্ষয় ও পরিবর্তিত হচ্ছে

আগে বর্ণিত মৌলিক শক্তিসমূহের ৪ নং শক্তি- দুর্বল আনবিক শক্তির প্রক্রিয়ায় যে বস্তু ক্ষয় হয়, তা উল্লেখিত হয়েছে। এবার আমি অত্যন্ত সরল ভাষায় জড় জগতের প্রতিটি বস্তু কিভাবে সময়ের আবর্তে ধ্বংস ও পরিবর্তিত হচ্ছে, সে আলোচনায় যাচ্ছি।

সময়ের আবর্তে মানুষসহ জীবজন্তু ও উদ্ভিদ জগতের যেমন মরণ আছে, ঠিক তদ্রূপ বস্তুরও চিরমরণ আছে। বস্তুর স্থায়ীত্ব যে চিরন্তন নয়, তা এখন বিজ্ঞানও প্রমাণ করেছে।



জড় জগতে পার্টিকেল (কণা) যেমন আছে, তেমনি এর বিপরিতধর্মী আরেকটি এ্যান্টিপার্টিকেল (অকণা) আছে। এ দুটো যেই মুহূর্তে একত্রিত হয় তখন দুটিই

ধ্বংস হয়ে যায়। অর্থাৎ একটা আরেকটাকে ধ্বংস করে দিয়ে শূন্যে রূপান্তরিত হয়। ব্যাপারটা আরো বুঝিয়ে বলছি।

মনে করুন আমার হাতে একটি বল আছে যেটি মেটার বা বস্তু এবং আপনার হাতে আরেকটি বল আছে যা হচ্ছে এ্যান্টিমেটার বা অবস্তু। এখন আমরা দুজনেই যদি বলগুলোকে ছুঁড়ে দিই এবং একটা আরেকটার উপরে পড়ে তবে দুটিই অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে! আপনার বল ও আমারটি আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না, কারণ এগুলোর অস্তিত্ব এখন আর এ জগতে নেই। তবে আপনার হাতে থাকাকালীন অবস্তুটিও অস্তিত্বশীল ছিলো এবং আমারটিও ছিলো। মেটার-এ্যান্টিমেটার এর ব্যাপারটা এরকম। সৌভাগ্যবশতঃ জগতসৃষ্টির পরমুহূর্তেই সিংহভাগ এ্যান্টিমেটার গায়েব হয়ে যায়। এর ফলে জগত তখনই ধ্বংস হয়ে যায় নি। তবে আল্লাহর ইচ্ছায় যে মুহূর্তেই কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন হয়তো এগুলো আবার আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এ্যান্টিমেটার বা অবস্তু আবিষ্কারের ফলে আল্লাহর এ দু'টি পবিত্র বাক্যের অর্থ পরিষ্কার হয়েছে:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

অর্থাৎ "জগতের সবকিছুই ধ্বংস হবে। থাকবেন শুধু তোমার রব্ব, যিনি মহামহিম ও সম্মানিত।" [সূরা আর-রাহমান (৫৫):২৬-২৭]।

আমরা জানি কিয়ামত দিবসে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। কোন বস্তুই অস্তিত্বশীল থাকবে না। কিন্তু সাধারণতঃ কোন বস্তুই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় না। এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হয় মাত্র। আগুন যখন এক টুকরো কাগজকে পুড়িয়ে দেয় তখন কাগজ আর থাকে না বটে কিন্তু ছাঁই থেকে যায়। পানি যখন অগ্নির উত্তাপে বা খরায় শুকিয়ে যায় তখন তা বাষ্পে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে গিয়ে পোঁছে। পানি আসলে ধ্বংস হয় না। এককথায়, কোন বস্তুই এ জগত থেকে ধ্বংস হয় না, শুধু এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয়।

কিয়ামত আস্‌লে কিন্তু সমগ্র বস্তুজগত অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে, বস্তুজগত বলতে কিছুই থাকবে না। তা কিভাবে হবে আজকের বিজ্ঞান বলে দিচ্ছে।

এ্যান্টিমেটার ও মেটারে সংঘর্ষ লেগে সম্পূর্ণ ধ্বংস ও অস্তিত্বহীন হবে। এটা হলো বিজ্ঞানের আবিষ্কার। কিন্তু ঠিক এভাবেই ধ্বংস হবে কি-না তা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাই ভালো জানেন। তবে আমরা বলতে পারি যে, যদি মেটার-এ্যান্টিমেটারের সংঘর্ষে সবকিছু সত্যিই ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে, আল্লাহর রব্বুবিয়তের মধ্যে এ জগত ধ্বংসের আইনও সন্নিবেশিত হয়ে আছে। সুবহানাল্লাহ!

বস্তুজগত স্বভাবের মাঝে অন্য একটি উপায়েও পরিবর্তিত হচ্ছে। এটাকে বস্তুর বিবর্তন বলা চলে। বিজ্ঞানের ভাষায় এ প্রক্রিয়াকে হাফ-লাইফ বা অর্ধ-জীবন বলে।

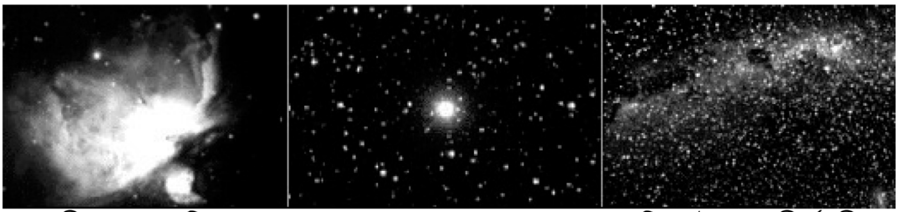
যে কোন রেডিও-এ্যাকটিভ বা তেজষ্ক্রিয়াসম্পন্ন জড়বস্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বদলে গিয়ে অন্য আরেকটি জড়বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বস্তুর মাত্রা (ওজন) বা ম্যাস এক একটি অর্ধ-জীবনের পক্রিয়ায় অর্ধেক, এক চতুর্থাংশ প্রভৃতিতে নেমে আসে। মনে করুন আপনার কাছে ১ কেজি তেজষ্ক্রিয়াসম্পন্ন জড়বস্তু, যেমন রেডিয়াম (একটি মৌলিক পদার্থ) আছে। এ পদার্থের অর্ধ-জীবন হচ্ছে ১,৬০০ বছর। আপনি অতি যত্নে এ মূল্যবান পদার্থটি আপনার বংশধরদের জন্য রেখে গেলেন। তারা যদি আগেই তা বিক্রি না করে তবে অবশ্যই ১,৬০০ বছর পরে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ তখন আপনার এ রেডিয়ামটুকুর অর্ধেক বদলে যাবে এবং তা অন্য দু'টি পদার্থ- রেডন ও হিলিয়ামে রূপান্তরিত হবে। এ প্রক্রিয়ার নামই হচ্ছে অর্ধ-জীবন। বস্তুর হাফ-লাইফ এর মান এক মুহূর্ত থেকে ১০ বিলিয়ন বছর পর্যন্ত হতে পারে। আমরা অনেকেই মনে করি হীরা হচ্ছে চিরন্তন বস্তু। বলা হয়, **"ডায়মন্ড ইজ ফরেবার"**- কিন্তু আসলে তা মোটেই নয়। হীরারও হাফ-লাইফ আছে। তবে তা ৪ বিলিয়ন বছর! সুতরাং হয়তো আমাদের ক্ষেত্রে হীরাকে চিরন্তর বলাটা একেবারে অবাস্তব নয়।

য হোক, হাফ-লাইফ যে আছে বিজ্ঞান তা আবিষ্কার করে আল্লাহর রব্বুবিয়তের আওতাভূক্ত আরেকটি সত্য প্রমাণিত করলো।

(ঘ) সূর্যের জীবন কবে এবং কেন শেষ হবে?

বিজ্ঞানের মতে আজ থেকে প্রায় ৫ বিলিয়ন (পাঁচ হাজার মিলিয়ন বা পাঁচশ কোটি) বছর আগে সূর্যসহ এ সৌরজগতের জন্ম হয়। সূর্যটি হচ্ছে সৌরজগতের কেন্দ্রস্থল। সমগ্র সৌরজগতের ৯৯% ওজন বা বস্তু এই সূর্যের মধ্যেই নিহিত। মহাকর্ষের ফলে পৃথিবীসহ সৌরজগতের যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহগুলো সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু এ উজ্জ্বল জ্বলন্ত বিশাল বস্তুটি আসলে কি?

সূর্য হচ্ছে বিশ্ব জগতের আরোও অগণিত তারাদের মতো একটি হলুদ বর্ণের জ্বলন্ত তারকা। এতে সিংহভাগ হাইড্রোজেন পদার্থ আছে। মহাকর্ষের প্রচণ্ড চাপে ও উঁচ্চতাপে সূর্যের ভেতরে আনবিক স্কেলে নিউক্লিয়ার রিয়েকশন বা প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। সূর্যের ভেতরের তাপমাত্রা ৬ মিলিয়ন ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। আনবিক এ রিয়েকশনের মাধ্যমে হাইড্রোজেন ক্ষয় হচ্ছে ইন্ধন হিসেবে। অর্থাৎ সূর্যকে জ্বলন্ত রাখতে যে পদার্থ ব্যবহার হচ্ছে তার মাত্রা দিন দিন কমে আসছে। অবশ্য এ প্রক্রিয়া সূর্যের জন্ম থেকেই সংঘটিত হচ্ছে।



তারাজীবন: একটি তারার জন্ম হয় 'নেব্যুলায়' (বায়ের ছবি), উজ্জ্বল দীর্ঘ জীবন (মাঝের ছবি) এবং বিস্ফোরণের মাধ্যমে মৃত্যু (ডানের ছবি)।

সূদীর্ঘ ৫০০ কোটি বছর ধরে হাইড্রোজেন পুড়ে কিন্তু শেষ হয় নি। আনবিক চুল্লীতে অল্প বস্তুই অনেক এনার্জি বা উদ্যম সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের নিকটতম তারা এ সূর্যটি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আনবিক রিকেশনের মাধ্যমে সূর্যটি জ্বলন্ত না থেকে যদি স্বাভাবিকভাবে পুড়তো, তবে মাত্র কয়েক হাজার বছর পরই

হাইড্রোজেন শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহ পাক অপূর্ব কৌশলে সূর্যকে আনবিক রিয়েকশনের মাধ্যমে জ্বলন্ত রেখে এর জীবন সুদীর্ঘ করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহর রব্বুবিয়তের স্বরূপ ও অনুগ্রহের বিকাশ।

তবে সূর্যের ইন্ধন বা জ্বালানী হাইড্রোজেন যে, চিরকাল স্থায়ী থাকবে না- তা আমাদেরকে আজ বিজ্ঞানই বলে দিচ্ছে। যদিও সূর্যটি সম্ভবত তার জীবনের অর্ধেক সীমায় পৌঁছেছে মাত্র, তথাপি এটা যে একদা ধ্বংস হবে তা নিশ্চিত। বিজ্ঞান আমাদেরকে ধ্বংস হওয়ার তারিখ সুদূর ভবিষ্যতে বলে, কিছুটা সুস্থির করেছে। আজ থেকে আরো ৫০০ কোটি বছর পরে সূর্যের ভেতর আনবিক রিয়েকশন শেষ হবে। তখন এটা চতুর্দিকে বেড়ে যেয়ে এমনকি পৃথিবীকে পর্যন্ত তার ভেতরে নিয়ে যাবে। কেউ যদি সেদিন বেঁচে থাকে, তখন সে দেখতে পাবে সূর্যটা সত্যিই তার মাথার উপর অবস্থান করছে।

সূর্যের জীবন একদিন শেষ হবে এবং তা চন্দ্রকেও যে গিলে ফেলবে সে কথা আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন:

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

-অর্থাৎ "এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে।" [সূরা ক্বিয়ামাহ (৭৫):৯]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

-"যখন সূর্য আলোকহীন হয়ে যাবে।" [সূরা তাকউইর (৮১):১]

উপর্যুক্ত প্রথম আয়াতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে যেয়ে বলতেই হয়, সূর্যের **'রেড জায়ান্ট'** পর্যায়টি এখানে ইঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। এসময় চন্দ্রের কোন অস্তিত্বও থাকবে না। বাস্তবেই চন্দ্র ও সূর্য একত্রিত হয়ে পড়বে। দ্বিতীয় আয়াতে করীম দ্বারা সূর্যের পরবর্তী পর্যায়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিজ্ঞান বলছে, লাল দৈত্যরূপ পর্যায় শেষে সূর্য একটি অনুজ্জ্বল **'বামন'** (ডোর্ফ) তারায় পরিণত হবে।

সূর্যের এরূপ শেষ পরিণতির কথা অতীতে কেউ জানতো না। এখন বিজ্ঞান আমাদেরকে গ্রহণযোগ্য যুক্তি ও তথ্যনির্ভর পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা দ্বারা এসব সত্য উদঘাটন করে দিচ্ছে।

(ঙ) পৃথিবীটা প্রাণীদের জন্য উপযোগী হলো কিভাবে?

আমাদের এ পৃথিবী সম্পর্কে বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করছে, তা একটু চিন্তা করে দেখা দরকার। মহাকাশে অবস্থান, সৌরজগতে সূর্য থেকে দূরত্ব, আহ্নিক ও বার্ষিক গতি, বায়ুমণ্ডল প্রভৃতি অনেক ধরনের সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা থাকায়ই এ পৃথিবীতে প্রাণীদের বসবাস সম্ভব হয়েছে।

আমাদের পৃথিবীটা যদি সূর্য থেকে বেশী দূরত্বে অবস্থান করতো তবে অবশ্যই এর তাপমাত্রা বেশী হীম-শীতল থাকতো। অন্যদিকে বেশী কাছে হলেও তাপমাত্রা হতো অনেকগুণ বেশী। প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য সঠিক তাপমাত্রা ও আলো থাকাটা জরুরী। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মহাকাশে ঠিক সঠিক স্থানে এ পৃথিবীকে ঝুলন্ত রেখে প্রাণীদের জন্য উপযোগী করেছেন। এটা তাঁর রব্বুবিয়তের আওতাভূক্ত একটি পদ্ধতি।

পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির ফলে দিবা-রাত্র এবং বিভিন্ন মৌসুমের উৎপত্তি হয়। এছাড়া আগেই বলেছি এ দুটি গতি না থাকলে পৃথিবীটা সূর্যের উপর পড়ে গিয়ে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যেতো। সূর্যের মহাকর্ষ একে টেনে তার উপর নিয়ে ফেলে দিতো।

পৃথিবীতে যাকিছু জড়বস্তু আছে, তা একটি বায়ুমণ্ডলকে ধরে রাখতে পারে, এমন পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে। পৃথিবী যদি চন্দ্রের মতো ছোট হতো তবে বায়ুমণ্ডল থাকতো না। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে জড়ের স্বল্পতাহেতু পর্যাপ্ত পরিমাণ মহাকর্ষ থাকতো না। চন্দ্রের মহাকর্ষ পৃথিবীর তুলনায় অনেক কম হওয়ায় (৬ ভাগের এক ভাগ) এটিতে কোন বায়ুমণ্ডল নেই। আর বায়ুমণ্ডল না থাকলে কোন প্রাণী বাঁচতে

পারে না। জীবনের জরুরী পদার্থ হচ্ছে অক্সিজেন। এ গ্যাসটি বায়ুমণ্ডলেই অবস্থান করে এবং আমরা তা শ্বাসগ্রহণ করি। বায়ুমণ্ডল অবশ্যই শুধু অক্সিজেনের যোগান দেয় না, ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলে আয়োনোস্ফেয়ার নামে একটি স্তর আছে। এ স্তরটি সূর্য থেকে আগত মারাত্মক আলট্রাভাইলোট রেডিয়েশনকে আটকে রাখে। এ রেডিয়েশন ভূগোলকের উপরিভাগে যদি আস্তো তবে প্রাণীরা বাঁচতে পারতো না। বায়ুমণ্ডল আরোও অনেক উপকার করে থাকে। যেমনঃ পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তন বায়ুমণ্ডলের নানাবিধ প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয়।

মোটকথা মহাকাশে পৃথিবীর অবস্থান, গতি, এর মধ্যে জড়বস্তুর মাত্রা প্রভৃতি সবকিছুই আল্লাহর পালনকারিতার আওতাভূক্ত। এগুলো তিনি যথাযথ করেছেন। আমারেদকে পালন করতে তাঁর অনুগ্রহের কোন সীমা নেই। পাঠকরা একটু ভেবে দেখুন।

(চ) আমাদের উপকারে একটি বৃক্ষের অবদান

আমরা সর্বদাই এ পৃথিবীর বুকে সর্বত্র বৃক্ষ-তরু-লতা দেখি। কিন্তু আমরা কি একবারও ভাবি যে এই বৃক্ষটি, বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে আমাদের কিসব উপকার করছে। সবুজ পল্লবীবিশিষ্ট প্রতিটি গাছই আমাদের জন্য অপূর্ব পদ্ধতিতে একটি জিনিস উৎপাদন করে যাচ্ছে। এ জিনিসটি হচ্ছে অক্সিজেন। আর জীবন ধারণের ক্ষেত্রে অক্সিজেনের প্রয়োজনীতা যে কতটুকু তা বলার উপেক্ষা রাখে না।

এবার দেখা যাক কিভাবে একটি বৃক্ষ, এ অক্সিজেন উৎপাদন করে।

যে সুনিপুণ পদ্ধতিতে সবুজ বৃক্ষরাজি অক্সিজেন উৎপাদন করে, তাকে বিজ্ঞানের ভাষায় ফটোসিনথেসিস বলে। এটা একটি বায়োলজিক্যাল প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করেই যাবতীয় প্রাণীজগত জীবনরক্ষা করে। ফটোসিনথেটিক প্রক্রিয়াকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। এগুলো হলো (১) সূর্যালোক শোষণের পর্যায়, যাকে আলোক প্রতিক্রিয়া বলা হয় ও (২) কার্বন (একটি পদার্থ) স্থিরীকরণ পর্যায়, যাকে কৃষ্ণ প্রতিক্রিয়া (কার্বনের রং কালো তাই) বলা হয়।

আলোক প্রতিক্রিয়াঃ সূর্য থেকে আগত অংশুজাল সবুজ পাতার রঙ্গিন কোষগুলো (ক্লোরোফিলস) গ্রহণ করে স্থিরীকৃত করে। অর্থাৎ সূর্যের এনার্জি আটকে রাখে। এর ফলে পাতার মধ্যে সামান্যতম বৈদ্যুতিক কারেন্ট প্রবাহিত হয় এবং এ থেকে এনার্জি (সূর্য থেকে আলোর সাথে আগত) পরিবর্তিত হয়ে দুটি কেমিক্যালে রূপান্তরিত হয়। এগুলোর নাম হচ্ছে এটিপি ও এনএডিপিএইচ। এ কেমিক্যালগুলো আসলে কি তা এখানে বলার প্রয়োজন নেই। তবে এ থেকে শেষ পর্যন্ত প্রাণীদের উপযোগী অক্সিজেন কিভাবে উৎপাদিত হয় সেটিই এ প্রসঙ্গে মুখ্য।

কৃষ্ণ প্রতিক্রিয়াঃ এ প্রতিক্রিয়ার ফলে এটিপি ও এনএডিপিএইচ-তে যে এনার্জি বা উদ্যম সংগ্রহিত হয়েছে, তা ভেঙ্গে অর্গানিক বা জৈবিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়।

ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত অক্সিজেন গ্যাস বায়ুমণ্ডলে রিলিজ হয়। এর ফলে আকাশে-বাতাসে অক্সিজেন সাপ্লাই নিশ্চিত থাকে এবং এ গ্রহে প্রাণীদের বেঁচে থাকা সম্ভব হচ্ছে। অন্যথায় আমাদের দ্বারা প্রতি সেকেন্ডে অক্সিজেন শ্বাসের মাধ্যমে ভেতরে নেওয়ার ফলে অচিরেই তা শেষ হয়ে যেতো। কারণ আমরা নিঃশ্বাসের সময় অক্সিজেন বের করি না। অক্সিজেন দেহের প্রতিটি অংশে সরবারাহ হয় রক্তের মাধ্যমে। যে বাতাস নিঃশ্বাসের সাথে বেরিয়ে আসে তা হলো কার্বন ডাইয়োক্সাইড গ্যাস ও পানি। মূলতঃ শ্বাস ও নিঃশ্বাসের মধ্যে একটা কেমিক্যাল রিয়েকশন হয়। এতে আমরা শ্বাস নেওয়ার সময় বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন এবং অর্গানিক পদার্থ গ্রহণ করি এবং নিঃশ্বাসের সময় কার্বন ডাইয়োক্সাইড ও পানি বের করি। অন্যদিকে ফটোসিনথেসিস রিয়েকশনের সময় কার্বন ডাইয়োক্সাইড এবং পানি থেকে অর্গানিক পদার্থ ও অক্সিজেন উৎপাদিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। সুতারাং ফটোসিনথেসিস আসলে শ্বাস-নিঃশ্বাসের বিপরিত একটি প্রসেস।

আল্লাহর কী অপূর্ব মহিমা যে, বৃক্ষ-তরু-লতা দ্বারা আমাদেরকে জীবিত রাখছেন। আসলে আল্লাহ পাক এ জগতের প্রতিটি বস্তুই কোন না কোন উপকার বা উদ্দেশ্যহেতু সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কালামে হাকীমে বলেন:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ

অর্থাৎ "মহাকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের কোন কিছুই বেহুদা সৃষ্টি করি নি। কিয়ামত অবশ্যই আসবে। অতএব পরম ঔদাসীন্যের সাথে ওদের ক্রিয়াকর্ম উপেক্ষা করুন" [সূরা হিজ্বর (১৫):৮৫]।

মূলত এ জগতের প্রতিটি বস্তুই আল্লাহর পালনকারিতার গুণাবলীরই প্রকাশ।

(ছ) সমগ্র বিশ্বজগত মানুষের জন্য সৃষ্ট হয়েছে, তার অর্থ কি?

ইতোমধ্যে যাকিছু বলা হয়েছে, তা থেকে পাঠকরা নিশ্চয়ই কিছুটা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে, এ জগতের সবকিছুই কোন না কোন বিশেষ প্রয়োজনে সৃষ্ট। স্বভাবের প্রতিটি বস্তুই উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি হয় নি। আর প্রতিটি প্রক্রিয়া ও ঘটনাও বিনা কারণে সংঘটিত হয় না।

বিজ্ঞান আজ আমাদেরকে মানুষের জীবন রক্ষার্থে সূর্য ও পৃথিবীর অনেককিছু যে অপরিহার্য তা দেখিয়ে দিচ্ছে। সূর্যের আলো ও তাপ, মহাকাশে এর অবস্থান, এর আয়তন ও জ্বলন্ত থাকার ক্ষমতা প্রভৃতি মানুষের জন্য শুধু উপকারী নয়, একান্ত জরুরীও বটে। এ পৃথিবীতেও আরো অনেক ধরনের সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা আছে যার ফলে মানুষসহ যাবতীয় প্রাণীজগতের জন্য এর উপর বেঁচে থাকাটা সম্ভবপর হচ্ছে। কতো ধরনের উত্তম ব্যবস্থা যে এই পৃথিবীর উপর মানুষের সেবায় নিয়োজিত আছে তা লিখে কখনো শেষ করা যাবে না। আর এ কথাটি আমার নিজের নয়, এটা বিজ্ঞানের। বিজ্ঞানই এসব তথ্য আবিষ্কার করছে।

সৌরজগত ও পৃথিবীটা আমাদের ধারে-কাছের বস্তু। এটা সুস্পষ্ট যে, মানুষের সেবায় সৌরজগতের সবকিছুই নিয়োজিত আছে। তাহলে প্রশ্ন আস্তে পারে, সূর্য ও পৃথিবী ছাড়া সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহগুলো কিভাবে মানুষের উপকার করে?

উপকার অবশ্যই করে। শুধু এই সৌরজগতই নয় সমগ্র বিশ্বজগতই মানুষের উপকার করে যাচ্ছে। সৌরজগতের ভেতরের অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহগুলো কিভাবে আমাদের উপকারে আসছে তার একটিমাত্র প্রমাণ দিচ্ছি।

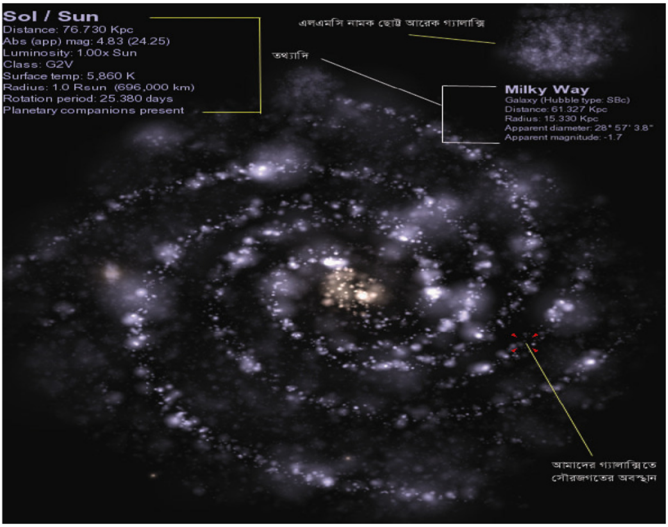


আমাদের পৃথিবীঃ সবদিকে সুবিধাসম্পন্ন সৌরজগরে একমাত্র গ্রহ পৃথিবী।

এটা বিজ্ঞানসম্মত উক্তি যে, সৌরজগতে গ্রহ-উপগ্রহের সংখ্যা ও এগুলোর সমন্বিত ওজন বা জড়ের মাত্রা স্বল্প বা বেশী হলে পৃথিবীর অবস্থান (সূর্য থেকে

দূরত্ব) অন্যত্র হয়ে যেত। কারণ এটা মনে রাখতে হবে যে, সৌরজগতে শুধু সূর্যের মহাকর্ষই বিদ্যমান নয়। এসাথে গ্রহগুলোর মধ্যেও একে অন্যের উপর মহাকর্ষের প্রভাব সৃষ্টি করে রেখেছে। সমগ্র সৌরমণ্ডল মিলেই একটা ব্যালান্স তৈরী হয়েছে। এ ব্যালান্স না থাকলে সবকিছু লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যেত।

আমি সমগ্র বিশ্বজগতই মানুষের উপকারে জড়িত এজন্যই বলেছি যে, মহাকাশের কোথায় কতদূরে তারাগুলো অবস্থান করে, তার উপর নির্ভর করে আমাদের এ সৌরজগতও ব্যালান্স সৃষ্টি করে ঘুর্ণমান আছে। সূর্যটা আসলে মহাকাশের এক বিরাট তারকাজগতের একটি তারা। এ তারাজগতে অন্তত ১০০ বিলিয়ন তারার বাসস্থান। এগুলো তারাজগতের কেন্দ্রের (গ্যালাক্সির) উপর নির্ভর করে ঘুর্ণমান অবস্থায় আছে। এখানে সেই মহাকর্ষই কাজ করছে। জগতে আরোও এরূপ শতকোটি গ্যালাক্সি বা তারাজগত আছে। এ সবগুলোই একে অন্যের উপর ভিত্তি করে ঘুরছে। সুতরাং সমগ্র জগতটা নিয়েই একটি সম্পূর্ণ রব্বুবিয়ত বা পালনকারিতা ক্রিয়াশীল আছে। পুরো বিশ্বব্যাপী সৃষ্ট হয়েছে এক অপূর্ব ব্যালান্স। এর হেরফের হলেই কিন্তু মহাদুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।



ছায়াপথে সৌরজগৎ: আমাদের সৌরজগৎ 'মিল্কিওয়ে' নামক বিরাট গ্যালাক্সির একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। পূর্বের পৃষ্ঠার চিত্রে সূর্যের অবস্থান দেখা যাচ্ছে। গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে সঠিক দূরত্বে থাকার ফলেই এটি স্থিতিশীল ও প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য উপযোগী হয়েছে।

এ পৃথিবীতে আমাদের অবস্থান সমগ্র জগতের এই সুবিন্যস্ত আয়োজনের উপরই নির্ভরশীল। আশাকরি পাঠকরা এবার সবকিছু যে মানুষের জন্য সৃষ্ট হয়েছে, এর মর্ম কিছুটা অনুধাবন করতে পারছেন। আল্লাহর পবিত্র দরবারে আমাদেরকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে কী শেষ করা যাবে? আমাদের জন্য এতো আয়োজন! এ জন্যেই আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন:

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

অর্থাৎ "বল, সমুদ্র যদি কালি হয় তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাবাদ লেখার জন্য তবে তা লেখার আগেই সে সমুদ্র শেষ হয়ে যাবে, অনুরূপ আরেক সমুদ্র সাহায্যার্থে আনলেও।" [সূরা কাহফ (১৮):১০৯]

(জ) আল্লাহর রব্বুবিয়তের স্বরূপ উন্মোচনে সর্বাপেক্ষা কাছের জিনিস হচ্ছে মানবদেহ

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে পাঠকরা বস্তু বা জড়জগতে আল্লাহর রব্বুবিয়তের স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। কিন্তু রব্ব গুণের বিকাশ শুধুমাত্র জড়জগতেই সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাঁর অনুগ্রহ প্রকাশে মানবদেহে সর্বাপেক্ষা অপূর্ব সৃষ্টিক্ষমতা বিকাশ করেছেন। মানুষ যদি তার নিজের দেহমন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে তবে সে অবশ্যই রব্বুবিয়তের আসল স্বরূপ অনুধাবন করতে পারবে। এ ক্ষেত্রেও আজকের বিজ্ঞান আমাদের সাহায্য করতে পারে। বিজ্ঞান মায়ের গর্ভে

একটি শিশুর গর্ভধারণ মুহূর্ত থেকে জন্ম পর্যন্ত যেসব তথ্য আবিষ্কার করেছে তা আমাদের অবাক করে বৈকি।

নারীর গর্ভাশয়ে একটি ডিম্বকোষে একটি মাত্র শুক্র প্রবেশ করে একজন নতুন মানবসৃষ্টির প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটায়। অথচ একক কোন শুক্রকে মানুষ নগ্নচোখে দেখতেই পায় না। এই ডিম্বকোষ ও শুক্রের ভেতর কিসব গুপ্ত জৈবিক পদার্থ আছে, যা থেকে আস্ত একটি মানবদেহ সৃষ্টি হয়ে যায়? শুধু তাই নয়, এ দুটোর মিলনে যে ভ্রূণটি অস্তিত্বে আসে তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রং, রূপ, আকার, প্রভৃতি সবকিছুই ঐ দু'টি ক্ষুদ্রকায় জৈবিক পদার্থের মধ্যে লুকানো থাকে।

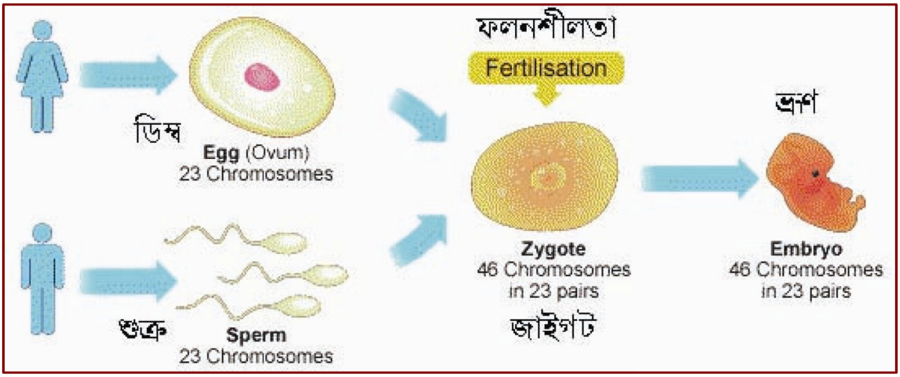
পাঠকরা এবার আসুন, মায়ের গর্ভে একটি শিশুর প্রতিপালন কিভাবে মহান রাব্বুল আলামীন করেন, তা বিজ্ঞানের ভাষায় তলিয়ে দেখি। লক্ষ করুন, প্রভুর রব্বুবিয়তের সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক বিকাশ কিভাবে ঘটে। এখানে আমি দ্বিতীয় পর্বে বর্ণিত মানবদেহের স্বরূপ পুনরুল্লেখ করছি। তবে এখন আশাকরি পাঠকরা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এ অংশটি পড়বেন।

(১) ডিএনএ (DNA) এবং আরএনএ (RNA): মা-বাবা থেকে শিশুর দেহের যাবতীয় তথ্যের সূত্র

প্রাণীজগত কোষ বা সেল দ্বারা সৃষ্ট। আমাদের দেহটির মধ্যে অসংখ্য সেল আছে। এই সেলগুলোর মধ্যে বিভিন্ন অংশ আছে। প্রতিটি সেলকে মেমব্রেন নামে একপ্রকার পদার্থ ঘিরে রাখে। বৃক্ষ-তরু-লতার সেলের চতুর্দিকে আরো একটি আলাদা শক্ত মেমব্রেন থাকে। এটাকে দেওয়াল বলা যায়। তবে মানুষের সেলের এই দেওয়াল তেমন শক্ত নয়।

মেমব্রেন এর ভেতর আছে সাইটোপ্লাজম নামক একপ্রকার জৈবিক পদার্থ। প্রতিটি সেলের একটি কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস আছে। এটির সাথে বাইরের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা হয় পোর্স বা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা। সেলের কেন্দ্রেই অবস্থান

করে এক বা একাধিক মৌলিক জৈবিক এসিড। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ডিএনএ (ডিওক্সিরিবোনিউক্লিক এসিড) আর অপর আকেরটি হলো আরএনএ (রিবোনিউক্লিক এসিড)।



ডিএনএ এর মধ্যে ক্রমোজাম নামক দুটি বস্তু আছে। এর একটি হলো এক্স-ক্রমোজাম আর অপরটি ওয়াই-ক্রমোজাম। প্রতিটি নবজাতকের যাবতীয় সৃষ্টি-কৌশল এই ডিএনএর মধ্যে কোড করা আছে। অন্যদিকে আরএনএ এর কাজ হলো প্রোটিন সিনথেসিস বা প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা। ডিএনএ এর মধ্যে কোড দেওয়া আছে নতুন শিশুর চুল, চামড়ার রং কিরূপ হবে, নাক চাপা না খাড়া হবে, চোখ বড় না ছোট হবে প্রভৃতি দেহের প্রতিটি অংশের অবস্থান ও গঠনপ্রণালী এই ডিএনএ-তে কোড করা আছে। মূলতঃ ডিএনএ-কে মানবদেহ তৈরীর ব্লু-প্রিন্ট বলা যায়। এখানে অংকিত আছে সবকিছু। ডিএনএ থেকে নির্দেশ যায় দেহের কোথায় কি এবং কোন ধরনের অংগ-প্রত্যঙ্গ তৈরী হবে। এবার দেখা যাক একটিমাত্র ক্ষুদ্র শুক্র ও ডিম্বাণূ থেকে কিভাবে আস্ত একটি মানুষের সৃষ্টি হয়।

গর্ভাশয়ে ভ্রূণের জন্ম মুহূর্ত থেকে নতুন সৃষ্ট একটি শিশু বেড়ে ওঠার বর্ণনা

মায়ের উদরে কিভাবে একটি শিশু পালিত হয় তা জানার বিজ্ঞানকে ভ্রূণবিদ্যা বা এ্যম্ব্রিয়োলজী বলে। এ প্রসঙ্গে এই জ্ঞানের শাখার উপর অত্যল্প আলোকপাত করাই উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে মায়ের উদরে কিভাবে পালন করলেন, তার একটি স্বরূপ বিজ্ঞানের ভাষায় তুলে ধরাই আমার কাম্য। সুতরাং কোন টেকনিক্যাল গবেষণায় না গিয়ে সরল ভাষায় ভ্রূণবিদ্যার উপর কিছুটা তথ্য আমি তুলে ধরছি মাত্র।

নারীদের গর্ভাশয়ে ফেলোপিয়ান টিউব নামে একটি অংশ আছে। এ টিউবে একটি বিশেষ স্থানে ডিম্বাণূ বা ওভিউম অপেক্ষা করতে থাকে। নারী-পুরুষের মিলনের ফলে পুরুষের শুক্রগুলো দ্রুত সেই অপেক্ষারত ডিম্বটির দিকে অগ্রসর হয়। অনেকের মতে ডিম্বের মধ্যে একধরনের কেমিক্যাল আছে যা এই শুক্রকে টেনে তার দিকে নিয়ে যায়। প্রতিটি শুক্রের আকার হচ্ছে ঠিক বেঙ্গাচির মতো। এদের একটি গোলাকার মাথা ও একটি লম্বা লেজ আছে। এগুলো লেজ নেড়ে নেড়ে সাঁতার কেটে ডিম্বকোষের দিকে অগ্রসর হয়। ডিম্বের আয়তন শুক্র থেকে অনেকগুণ বড়। শুক্রগুলো ডিম্বের চতুর্দিকে একত্রে ভেতরে ঢুকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। তবে একটিমাত্র ডিম্ব [সময় সময় দু'টি বা ততোধিক] ভেতরে প্রবেশ করামাত্রই ডিম্বের মধ্য থেকে একটি সিগনাল এসে আর ভেতরে ঢুকার সম্ভাবনাকে রহিত করে দেয়। বাস্তবে এ সিগনালটির উৎপত্তিস্থল হচ্ছে মস্তিষ্ক।

এই ভেতরে ঢুকার মুহূর্তই হচ্ছে **ফারটিলাইজ** হওয়া বা **গর্ভধারণ** করা। এ মুহূর্তের তিনদিন পরেই ডিমটি ইউটেরাস বা আসল গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে। এর পরই ডিমের কেন্দ্রে ভ্রূণটি বাড়তে শুরু করে। অন্যদিকে ডিমের অন্যান্য অংশ থেকে প্লাসেন্টা বা নাভী সংযুক্তি সৃষ্টি হয়। এই প্লাসেন্টার মাধ্যমে নবজাতকের খাবার ও বর্জ্য পদার্থ মায়ের দেহের মাধ্যমে চলাফেরা করে।

ভ্রূণটি যাতে সহজে এবং নিরাপদে বেড়ে উঠতে পারে এজন্য তার চতুর্দিকে মাত্র ৭ দিনের মধ্যেই একধরনের পানীয় দ্রব্য তৈরী হয়। এ তরল পিচ্ছিল পানীয় দ্রব্যের মধ্যে ভ্রূণটি ভাসতে থাকে। মায়ের ছোটাছুটি ও নড়াচড়ায় যাতে ভ্রূণটির দৈহিক কোন ক্ষতি না নয়, এ নিশ্চয়তা দেয় এই পানীয়টুকু। এ পানীয়কে বিজ্ঞানের ভাষায় এ্যামনিয়োটিক ফ্লোইড বলে। ক্রমাগত বেড়ে ওঠা এই ভ্রূণের ভেতর সেলগুলো সর্বদাই বিভক্ত হতে থাকে।

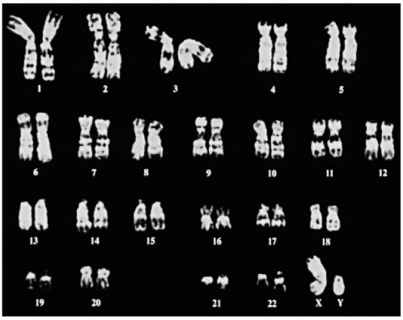
শেষ পর্যন্ত কয়েকদিনের মধ্যেই তিনটি আলাদা অংশে বিভক্ত হয়ে উন্নতি হতে থাকে। এ তিনটি অংশ থেকেই আস্ত মানবদেহ সৃষ্টি হয়। এ্যাক্সোডার্ম, মেসোডার্ম ও এ্যান্ডোডার্ম হচ্ছে এসব অংশের বৈজ্ঞানিক নাম। এ্যাক্সোডার্ম থেকে চামড়া, চুল, নখ, দাঁত প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। এটা নার্ভাস সিস্টেমকেও সৃষ্টি করে। মেরুদণ্ডের ভেতরের কোর্ড এবং মস্তিষ্কও এই অংশের দ্বারা তৈরী হয়। মেসোডার্মের মাধ্যমে মানবদেহের হাড্ডিগুলো এবং মাসুল বা পেশী তৈরী হয়। এছাড়া হৃদযন্ত্র, ছোটবড় ধমনী, কিডনী, ব্লাডার ও যৌনাঙ্গ এ অংশ থেকে সৃষ্টি হয়। মেসোডার্ম থেকে সৃষ্ট হৃদযন্ত্রটি মাত্র ২৪ দিনের মধ্যেই কম্পন বা বিট দেওয়া শুরু করে।

এ্যান্ডোডার্ম দ্বারা ডাইজেষ্টিভ টিউব বা আঁত এবং শ্বাস-প্রশ্বাস সিস্টেমের ভেতরের লাইনিং তৈরী হয়। প্রায় দশমাস মায়ের গর্ভে ভ্রূণটি এভাবে বড় হতে থাকে এবং অবশেষে পৃথিবীর আলো-বাতাসে বেঁচে থাকা ও আরোও দেড়যুগ যাবৎ বেড়ে ওঠার যাবতীয় উপায়-উপাদানসহ জন্মগ্রহণ করে। এ হচ্ছে অতি সংক্ষেপে মায়ের গর্ভে শিশুর জীবনবৃত্তান্ত। কোন উপাদান থেকে নবজাতক ছেলে না মেয়ে হিসেবে সৃষ্ট হয়, তা এবার একটু গবেষণা করে দেখা যাক।

মায়ের গর্ভের শিশু ছেলে না মেয়ে হবে তা একমাত্র পিতার উপর নির্ভরশীল

পুরুষের প্রতিটি শুক্র বা স্পার্ম দুটি অবস্থার একটি হয়ে থাকে। আগেই বলেছি ডিএনএ-এর মধ্যে ক্রমোজাম আছে। এর একটি হচ্ছে এক্স আর অপরটি ওয়াই ক্রমোজাম (এক্স বা ওয়াই নামগুলো ভিন্নতা বুঝাতে ব্যবহার করা হয় মাত্র)। পুরুষের শুক্রে থাকে এক্স এবং ওয়াই উভয় ক্রমোজাম। অন্যদিকে মহিলাদের

ডিম্বে আছে শুধুমাত্র এক্স ক্রমোজাম। আর ডিমের মধ্যে এই একক এক্স ক্রমোজাম সম্পূর্ণ অকেজো। তাই পুরুষের দুটি (এক্স এবং ওয়াই) ক্রমোজামের মধ্যে একটি মাত্র প্রয়োজন যা থেকে ডিমের মধ্যে একটি জোড়ার সৃষ্টি হয়। এই জোড়া হয় এক্স-এক্স না হয় এক্স-ওয়াই হবে। লক্ষ করুন ওয়াই-ওয়াই হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ নারীর ডিমের মধ্যে ওয়াই ক্রমোজাম অনুপস্থিত। এক্স-এক্স হলে শিশুটি মেয়ে হবে আর এক্স-ওয়াই হলে শিশুটি ছেলে হবে। এখানে লক্ষ করুন, যেহেতু নারীর ডিমের মধ্যে শুধুমাত্র এক্স আছে তাই নতুন শিশুটি ছেলে না মেয়ে হবে, তা নিশ্চিত করার কোন ক্ষমতা নারীদের নেই। কিন্তু পুরুষের এক্স এবং ওয়াই উভয়টি থাকায় নারীর এক্স এর সাথে উভয় জোড়া সৃষ্টি করতে পারে (অর্থাৎ, নারীর এক্স এর সাথে এক্স ক্রমোজাম দিয়ে এক্স-এক্স জোড়া বা ওয়াই দিয়ে এক্স-ওয়াই জোড়া তৈরী করে)। সুতরাং, নবজাতক শিশুটি ছেলে না মেয়ে হবে সেটা সম্পূর্ণরূপে পুরুষের উপরই নির্ভরশীল।



মানুষের ২৩ জোড়া ক্রমোজাম: লক্ষ্য করুন, শেষোক্ত (২৩ নং) ক্রমোজামের নীচে ইংরেজী 'X' ও 'Y' অক্ষর দেওয়া আছে। এ দু'টিই মানুষের 'যৌন ক্রমোজাম'। পুরুষের কাছ থেকে কোনটি আসলো তা-ই নিধারণ করে শিশু ছেলে না মেয়ে হবে। কারণ মহিলাদের আছে শুধুমাত্র 'X' ক্রমোজাম।

নতুন শিশুটি ছেলে না মেয়ে হবে সে ক্ষমতা একমাত্র পুরুষের মধ্যে আল্লাহ দান করেছেন। এটাও আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলের একটি পদ্ধতি। অথচ বহুকাল ধরে অজ্ঞতাহেতু পুরুষরা শুধু মেয়ে (বা ছেলে) জন্ম হওয়ায় নারীদেরকে দোষারোপ করে আসছে। কিন্তু বাস্তবে কোন দোষ থেকে থাকলে, তা তো তার নিজেরই!

ভ্রূণবিদ্যার উপর আমাদের সংক্ষিপ্ত তথ্যানুসন্ধানের এখানেই শেষ। আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়ের উপর একাধিক আয়াত নাজিল করেছেন। নিম্নে এর একটি উদ্ধৃত করছি। আল্লাহ জাল্লে জালালাহু ইরশাদ করেন:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

-"আমি মানুষকে মাটির সারাংশ (ডিম্ব ও শুক্রকোষ) থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু (ফলনশীল ডিম্বকোষ) রূপে এক সংরক্ষিত আঁধারে (ফেলোপিয়ান টিউবে) স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে (জাইগোট) সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি (ভ্রূণ), এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে নতুন রূপে দাঁড় (পূর্ণ শিশুতে রূপান্তর) করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।" [মু'মিনূন (২৩):১২-১৪]

মায়ের গর্ভে শিশু ছেলে না মেয়ে হবে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মিলে নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে। ইরশাদ হয়েছে:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى * مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى

-"এবং তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল- পুরুষ ও নারী। একবিন্দু **বীর্য** থেকে যখন স্খলিত করা হয়।" [নাজম (৫৩):৪৫-৪৬]

এখানে লক্ষণীয় যে, নারী ও পুরুষ তাঁর নির্দেশেই সৃষ্টি হয়- এ ঘোষণা দেওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ভাষায় ইরশাদ করছেন: যা থেকে নারী কিংবা পুরুষ হওয়ার সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয় তাহলো পুরুষের **বীর্য**। আজকের বিজ্ঞান ঠিক এ কথাটিই বলছে: ছেলে বা মেয়ে হওয়া একমাত্র পুরুষের বীর্যের উপর নির্ভরশীল।

অর্থাৎ বীর্যের মধ্যে এক্স না ওয়াই ক্রমোজাম আছে- তা-ই নির্দিষ্ট করে নবজাতক শিশুটি মেয়ে না ছেলে হবে।

বাহ্যিক জ্ঞান আহরণের উপায় পঞ্চেন্দ্রিয়

আল্লাহ পাক একটি মানুষকে সৃষ্টি করে এর দেহে অনেকধরনের ভিন্ন বস্তু ও অংশ সৃষ্টি করেছেন। এর সবগুলো মিলেই একটি পূর্ণ মানবদেহ জ্যান্ত থাকে এবং জীবনভর বিভিন্ন ফাংশন করে থাকে।

মানবদেহের প্রতিটি অংশই এক বা একাধিক কার্যে নিয়োজিত আছে। হৃদযন্ত্র দেহের সর্বত্র রক্ত প্রবাহিত করে, ফুসফুস স্বাস গ্রহণ নিশ্চিত করে এবং রক্তের মধ্যে অক্সিজেন সাপ্লাই দেয়। পকস্থলী খাদ্যদ্রব্যকে পরিপাক করার পর উপকারী দ্রব্যাদি দেহে রেখে বর্জ্য পদার্থ ভাওয়েলে নিক্ষিপ্ত করে। মাথার খুলিতে রক্ষিত মোটা ব্রেনটি দেহের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া কন্ট্রোল করে। এটা একটা মেমরী ষ্টোরেজ ও চিন্তার বস্তুও বটে। এছাড়া মানবদেহে আরোও কত কিছু বিদ্যমান, তার ইয়ত্তা নেই। ব্লাডার, কিডনী, লিভার প্রভৃতি যন্ত্রাংশও নির্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত আছে।

আল্লাহ পাক মানুষের সাথে বাইর জগতের সম্পর্ক সৃষ্টি করতে ও এ থেকে জ্ঞান আহরণের জন্য পাঁচটি ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করেছেন। এগুলো হলো, চোখ (দৃষ্টি), কর্ণ (শ্রবণ), নাক (গন্ধ), জিহ্বা (স্বাদ) ও ত্বক (ছোঁয়া)।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কার্যাবলী সম্পর্কে সবারই জানা আছে। তবে এগুলো আমরা অহরহ ব্যবহার করে কিভাবে জগতে বিচরণ করছি তা কি গভীরভাবে একবার ভেবে দেখেছি? এখানে আল্লাহর রব্বুবিয়তের কী অপূর্ব কৌশল কাজ করছে তা কি আমরা চিন্তা করি?

পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় ছাড়াও মানুষকে আল্লাহ পাক আরোও কয়েকটি ইন্দ্রিয় দান করেছেন। যেমনঃ বুদ্ধি, অনুভূতি, চিন্তা, চেতনা ও দিব্যদৃষ্টি। এবার সবগুলো

ইন্দ্রিয় সম্পর্কে একে একে আলোচনা করে দেখা যাক। এ আলোচনা থেকে পাঠকরা সহজেই আল্লাহর রব্বুবিয়তের আওতায় কী অপূর্ব কৌশল ক্রিয়াশীল আছে তা অনুধাবন করতে পারবেন।

(১) চক্ষু বা দৃষ্টিশক্তি: মানুষের চোখ একটি আশ্চর্য সৃষ্টি। বিজ্ঞানের দৃষ্টি থেকে চক্ষুকে একটি ক্যামেরার সাথে তুলনা করা যায়। ঠিক ক্যামেরার মতো বস্তু থেকে আগত আলো একটি লেন্সের ভেতর দিয়ে রেটিনা বা অক্ষিপটে (ক্যামেরার ক্ষেত্রে ফিল্মে) পতিত হয়ে বস্তুর একটি ছবি অংকিত হয়। এ ছবিটি পরে ব্রেনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছে। তবে ঠিক সাধারণ ছবির মতো হয়ে যায় না। এই আলো-আঁধারের খেলা থেকে মস্তিষ্ক কিভাবে দেখে তা বিজ্ঞান এখনো পরিষ্কার করে বলতে সক্ষম হয় নি। আমাদের চোখগুলো আসলে দেখে না, দেখে আমাদের ব্রেন। চোখের কাজ হলো বাইর জগতের আলো-আঁধার ব্রেনে নিয়ে পৌঁছানো। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ ব্রেন গবেষণা বা এ্যানালাইজ করে বোধশক্তিসম্পন্ন জিনিস হিসেবে দেখে। এ কঠিন কাজটি ঠিক কিভাবে মস্তিষ্ক সম্পন্ন করে তা এখনো সঠিকভাবে জানা যায়নি।

আল্লাহর কী অপূর্ব মহিমা এখানে কাজ করে তা বলে শেষ করার নয়। আমাদের ব্রেন শত শত ভিন্ন ধরন ও গঠনের বস্তু দেখতে পারে ও আলাদা করতে জানে। আল্লাহর পালনকারিতার কী অপূর্ব নিদর্শন এখানে লুকিয়ে আছে, তা-কি আমরা চিন্তা করেছি?

(২) নাক (গন্ধশক্তি) : নাকের সাহায্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদিত হয়। এর একটি হচ্ছে শ্বাস-নিঃশ্বাস আর অপরটি হলো গন্ধ অনুধাবন করার শক্তি। নাক থেকেও কিছু তথ্য ব্রেনে গিয়ে পৌঁছে এবং ব্রেন গন্ধের অনুভূতি দান করে। নাকের গভীরে ওলফেক্টরী নামক একটি অংশ আছে। এখানে কিছু গন্ধ অনুধাবন করার সেল বা কোষ আছে। বাতাসের সাথে বিভিন্ন জিনিসের বিভিন্ন কেমিক্যাল ও এদের আলাদা গন্ধ নাকের ভেতরে গিয়ে এই কোষগুলোতে প্রতিক্রিয়া করে। ওলফেক্টরী সেলে পতিত কেমিক্যাল তথ্য শেষ পর্যন্ত নার্ভ সেলের মাধ্যমে ব্রেনে গিয়ে পৌঁছে।

ব্রেন এসব তথ্য থেকে বিভিন্ন গন্ধ অনুধাবন করে। এভাবে আমরা সুগন্ধ ও দুর্গন্ধযুক্ত জিনিসের অর্থ কি বুঝতে পারি। এ ক্ষেত্রে ঠিক কিভাবে আমরা গন্ধ অনুধাবন করি তা বিজ্ঞান বের করতে সক্ষম হয় নি। এর একটা বিশেষ কারণ হলো, মানুষের মধ্যে ইন্টেলিজেন্স বা বুদ্ধিক্ষমতা এবং চেতনা আছে। সর্বোপরি আত্মা নামক একটি অজড় জিনিসের নিবাস মানুষের মধ্যে। ইন্দ্রিয়ের যন্ত্রগুলির (চোখ, কান, নাক, ত্বক ও জিহ্বার) মাধ্যমে আগত তথ্যসমূহ ব্রেন বুঝতে পারে, কিন্তু কে বুঝে? এ প্রশ্নের জবাব বিজ্ঞান জানে না। এটা ফিলোসফি ও আধ্যাত্মিকতার ব্যাপার। তবে এক্ষেত্রে এটুকুই বলা যথেষ্ট যে, মানুষ একটি যন্ত্র নয়। তার মধ্যে লুকিয়ে আছে বিরাট রহস্যের জগত। বিজ্ঞান সৃষ্ট বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করে। মানব দেহটিও একটি সৃষ্ট বস্তু, কিন্তু এটির সাথে জড়িত আছে অতিন্দ্রিয় জতগের সংযোজন, যা বিজ্ঞানের গণ্ডিসীমার বাইরে অবস্থান করে। মানবদেহের পরিচালন, এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়েই বিজ্ঞানের গবেষণা সীমিত।

আল্লাহ পাক '**সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম**' নামক এই মগজকে কী অপূর্ব কৌশলে সৃজন করেছেন! আমাদের এই ব্রেন একইসঙ্গে একটি সুপার-সুপার কম্পিউটার ও চিন্তাক্ষমতার অধিকারী জৈবিক উপাদান। এতে 'ইনপুট' হয় পঞ্চেন্দ্রিয় থেকে প্রাপ্ত অসংখ্য তথ্যাদি যা প্রসেস করে সে তা 'ইন্টেলিজেন্ট' নামক আমাদের অনুভুতিতে পৌছে দেয়- যা থেকে আমাদের মনে জন্ম নেয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভাব বা সাড়া। এছাড়া চিন্তা ও আধ্যাত্মিক জগতের সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদিও সে তার মেমরী সেলগুলোতে রাখতে ও প্রসেস করতে জানে।

(৩) জিহ্বা বা স্বাদঃ স্বাদ গ্রহণ করা ও বুঝার বস্তুটি হলো আমাদের জিহ্বা। জিহ্বা ও নাক একত্রে কাজ করে থাকে। এ দুটো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে খাবারের মধ্যে বিষাক্ত কিছু আছে কি না তা অনুধাবন করা যায়। এছাড়া সুস্বাদু মাজাদার খাবারের অনুভুতি আমাদেরকে আনন্দ দান করে।

জিহ্বার মধ্যে স্বাদ কি তা বুঝার মতো সেনসিটিভ (অনুধাবনযোগ্য) সেল আছে। কোন খাদ্যদ্রব্য জিহ্বায় পড়লেই এসব সেল লালার সাথে মিশে খাদ্যের স্বাদ অনুযায়ী বিভিন্ন নার্ভ সিগনাল ব্রেনে পাঠিয়ে দেয়। স্বাদ ও গন্ধ ব্রেনের যে অংশটুকু বুঝতে পারে তা ব্রেনের গোড়ায় অবস্থিত। জিহ্বার স্বাদ ও গন্ধ থেকে আমাদের অনুভূতি বা ইমোশনও উৎপন্ন হয়ে থাকে। এখানেও কি উপায়ে আমরা ব্রেন দিয়ে স্বাদ অনুভব করি বা আসলে কে তা করে, বিজ্ঞান ঠিকমতো বলতে ব্যর্থ হয়েছে। মূলত মানুষের চেতনা ও নিজস্ব পরিচিতি বলতে যা বুঝায়, এসব না থাকলে আমরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত কোন তথ্য অনুধাবন করতে পারতাম না।

(৪) কর্ণ বা শ্রবণেন্দ্রিয়ঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ও আরেকটি অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি। বাতাসে ভ্রমণকারী শব্দ-তরঙ্গ কানে পৌঁছলে কিছু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এর ফলে শব্দ-তরঙ্গ নার্ভ সেলের মাধ্যমে ব্রেনে গিয়ে পৌঁছে। যদিও শব্দের উৎপত্তি ভাইব্রেশন বা কম্পন থেকে কিন্তু ব্রেন এটাকে শব্দ হিসেবে শোনে। ব্রেনের ভেতর এমন কিছু গুপ্ত রহস্য লুকিয়ে আছে যে, ত্বক বা ছোঁয়া এটা পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিটি নার্ভ সিগনালকে (এক ধরনের ইলেকট্রিক তরঙ্গ) আলাদাভাবে বুঝতে পারে এবং সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে জানে। মূলতঃ ব্রেনকে এজন্যেই সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম বলা হয়। একমাত্র হৃদযন্ত্র ছাড়া আমাদের দেহের যাবতীয় ফাংশন বা কার্যকারিতা এই ব্রেনই নিয়ন্ত্রণ করে। দেখা, শোনা, অনুভব করা, চিন্তা, চেতনা, স্বাদ, গন্ধ, হাত-পায়ের চলাচলসহ প্রতিটি দৈহিক ফাংশন একমাত্র ব্রেনই কন্ট্রোল করে থাকে। মানবদেহে আল্লাহর রব্বুবিয়ত প্রকাশের সর্বাপেক্ষা জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি হচ্ছে এই মগজ।

কর্ণের কার্যকারিতা অনেকটা স্পিকারের মতো। কানের ভেতরে ইয়ার-ড্রাম নামে একটি অংশ আছে। এ ড্রামের মধ্যে বাতাস ভর্তি থাকে। বাইর থেকে আগত শব্দ-তরঙ্গ এই ড্রামের মধ্যে কম্পন শুরু করে। ড্রামের মধ্যে কিছু নার্ভ-সেল আছে যা ব্রেনের সাথে সংযুক্ত। আগত শব্দ ড্রাম থেকে এই নার্ভ সেলের মাধ্যমে ব্রেনে পৌঁছে এবং ব্রেন তা শব্দ হিসেবে আমাদের চেতনায় জানিয়ে দেয়। এভাবে আমরা জগতের সকল শব্দ শ্রবণ করে থাকি।

(৫) ত্বক বা ছোঁয়াঃ আমরা চোখ বন্ধ করে রাখলেও কেউ যদি আমাদের হাতে একটি ছোট বল দেয় তবে আমরা বলতে পারি এটা গোলাকার একটি বল। অনুরূপভাবে এটা যদি অন্য কোন আকারের বস্তু হয় তবে তা আমরা সহজে বুঝতে পারি বস্তুটির আকার কি। এই ছোঁয়ার মাধ্যমে জানাও আল্লাহর রব্বুবিয়তের একটি বিকাশ মাত্র। এটাকে টাচ বা ছোঁয়ার ইন্দ্রিয় বলে। ত্বক বা চামড়ার মধ্যে সর্বত্র এক ধরনের নার্ভ সেল অনুধাবনযোগ্য কোষ আছে। আমরা যখন কিছু স্পর্শ করি তখন এগুলোর মাধ্যমে অনেক সিগনাল আলোকের গতিতে ব্রেনে গিয়ে পৌঁছে। ব্রেন তখন এসব সিগনালকে ব্যাখ্যা করে চেতনার মধ্যে অনুভূতি জাগায়। আমরা তখন বুঝতে পারি যে বস্তুটি স্পর্শ করেছি, তা কী হয় এবং এটা গরম না ঠাণ্ডা, লম্বা না বেটে, ভারী না হালকা, কঠিন না তরল প্রভৃতি।

এ হচ্ছে আমাদের দেহের পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় এবং এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। এক্ষেত্রে আর বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই।

এ পাঁচটি বাহ্যিক ইন্দ্রিয় ছাড়াও আরো একাধিক চেতনা সৃষ্টিকারী ইন্দ্রিয়সমূহ মানুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল আছে। যেমনঃ ব্যথা, উষ্ণতা, ব্যালান্স, হাড্ডির জোড়ার অবস্থান, পেশী ও এতে সৃষ্ট চাপ এবং রক্তচাপ। এসব ক্ষেত্রেও ব্রেনে তথ্যসমূহ আসে (মস্তিষ্ক ইনফরমেশন পায়)। এখানে উল্লেখ্য যে, কিছু কিছু তথ্য ব্রেনে পৌঁছলেও আমাদের চেতনা বা কনশিয়াসনেছ তা বুঝতে পারে না। যেমন রক্তচাপের ক্ষেত্রে ব্রেনে আগত তথ্য অনুযায়ী চাপের মধ্যে ব্যালান্স তৈরী করে স্বাভাবিক করা হয়। অন্য আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, দেহের মধ্যে কোন রোগজীবাণু প্রবেশ করলে রক্তের মধ্যে এ্যান্টিবডি নামে কিছু সেল আছে (সাদা সেল), এগুলো এই ফরেন (বাইরের) জীবাণুগুলোকে আক্রমণ করে। এটাকে দেহের ইম্যিউন সিষ্টেম [রোগজীবাণূ নির্মূল করার ক্ষমতা বা রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা] বলে। তবে রোগজীবণূগুলো যে দেহে প্রবেশ করেছে এ তথ্য ব্রেনে নার্ভ সেলের মাধ্যমে পৌছার পরই সেখান থেকে আক্রমণের ওর্ডার আসে। এরূপ অসংখ্য তথ্যাবলী ব্রেন ও দেহের মধ্যে চলাচল করছে যার খবর আমাদের চেতনা মোটেই জানে না।

আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এসব আয়োজন করা হয়েছে। অথচ কী আশ্চর্যের ব্যাপার যে, অবিশ্বাসীরা এসব বিষয়বস্তু জেনেও আল্লাহ থেকে ঘাড় ফিরিয়ে নেয়। আর এ জন্যেই তো আল্লাহকে অস্বীকার করা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা জঘন্য অপরাধ। যে আল্লাহ মানুষকে অস্তিত্বদান করতে এতো কিছু করলেন, এতো আয়োজন করলেন আর সেই বিচরণশীল জ্যান্ত মানুষ তাঁর অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করবে? আল্লাহ পাক তাই এদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ * وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

অর্থাৎ "তিনিই তোমাদের চক্ষু, কর্ণ এবং অন্তকরণ (যাবতীয় ইন্দ্রিয়সমূহ) দান করেছেন; তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞ। তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের ছড়িয়েছেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। তিনিই জীবন (চেতনা, অনুভূতি, চলনশক্তি, প্রাণ, আত্মা) ও মৃত্যু ঘটান, তাঁরই হুকুমে রাত্র-দিনের বিবর্তন ঘটে (জগত পরিচালিত হয়); তবুও কি (তোমরা) বুঝবে না?" [সূরা মু'মিনূন (২৩):৭৮-৮০]

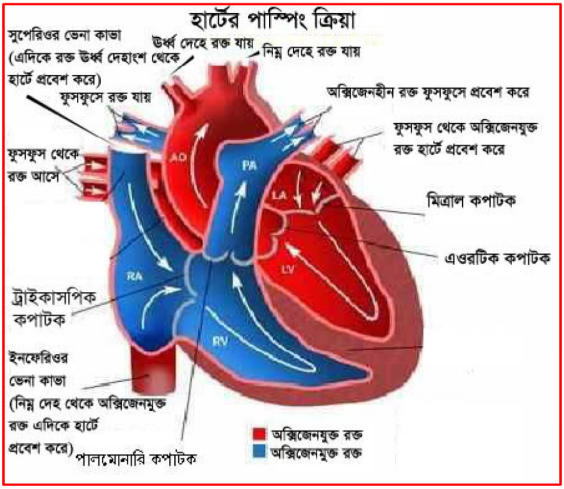
সুবহানাল্লাহ! এই পবিত্র আয়াতমালায় কী সুন্দর উপরে আলোচিত সবক'টি বিষয়বস্তু নিয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হয়েছে।

সক্রিয় একটি অপূর্ব পাম্প হৃদযন্ত্র

মানবদেহের প্রতিটি কোষে বা সেলে যে যন্ত্রটি রক্ত সরবরাহ করে সেটি হলো হৃদযন্ত্র। এ যন্ত্রের সাথে সমগ্র দেহের বিভিন্ন অংশের সরাসরি যোগাযোগ আছে। ধমনী, শিরা, উপশিরা প্রভৃতির মাধ্যমে এ যোগাযোগ রক্ষিত হয়।

মানবদেহের খাদ্যদ্রব্য হিসেবে আমরা সাধারণত তরল ও কঠিন পদার্থ গ্রহণ করে থাকি। তবে দেহের বিভিন্ন অংশ এবং সেলগুলো কিন্তু এ অবস্থায় খাদ্য থেকে উপকার গ্রহণ করতে অসমর্থ। আর আগেই বলেছি মানবদেহের প্রতিটি সেলই জ্যান্ত, সুতরাং তাদের খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্যকে যেসব অবস্থায় সেলগুলো গ্রহণ (ব্যবহার) করতে পারে তাহলো অক্সিজেন, কার্বন ডায়োক্সাইড, জৈবিক নিউট্রিয়েন্‌স প্রভৃতি।

যে সিস্টেমের মাধ্যমে এই খাদ্যগ্রহণ সম্ভব হয় সেটিই হচ্ছে মানবদেহের সার্কুলেটরী সিস্টেম (রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া)। এ সিস্টেমের কেন্দ্রীয় যন্ত্রটির নামই হচ্ছে হৃদযন্ত্র বা হার্ট। হার্টের ভেতর চারটি চেম্বার (কামরা) আছে। এগুলো হলো ডান ও বাম এ্যাট্রিরাম। এ দুটি চেম্বার দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে ফিরে-আসা রক্তকে গ্রহণ করে, বাকী আরো দুটি চেম্বার আছে যেগুলোকে



ডান ও বাম ভেনট্রিকোল বলে। ভেনট্রিকোলগুলোর মাধ্যমে রক্ত দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। আর্টারী বা ধমনী হচ্ছে রক্ত-ভেস্যাল, যার মাধ্যমে রক্ত হার্ট থেকে বেরিয়ে যায়। অপরদিকে শিরা বা ভেইন রক্তকে হার্টে নিয়ে আসে।

আর্টারী ও শিরার সাথে অসংখ্য ছোট ছোট উপশিরা বা ক্যাপিলারী সংযুক্ত আছে। এই ক্যাপিলারীর দেওয়াল থেকেই সেলগুলো রক্ত (রক্তে উপস্থিত খাদ্য) গ্রহণ করে এবং বর্জ্য (অনুপকারী বস্তু) ফিরিয়ে দেয়। এসব কার্য সম্পাদিত হয় হৃদযন্ত্রের পাম্প বা চাপ থেকে, যা একটি মানুষ যতোদিন বেঁচে থাকে ততোদিন পর্যন্ত অনবরত চলতে থাকে। বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, হৃদযন্ত্র কিভাবে কাজ

করে- কিন্তু এর পেশীগুলো যে অনবরত নিয়মমাফিক পাম্প করে যাচ্ছে তার সঠিক কারণ কি বলতে পারছেন না। দেহের প্রতিটি যন্ত্র ও অংশকে মস্তিষ্ক কন্ট্রোল করতে পারে কিন্তু হার্টকে পারে না।

আল্লাহর অপরিসীম করুণা যে, এই হৃদযন্ত্রকে অজানা শক্তি (অবশ্য তাঁর অজানা নয়) দিয়ে তিনি সক্রিয় রাখছেন। এসাথে দেহের প্রতিটি অংশকে জ্যান্ত রাখছেন, মূলতঃ প্রতিটি মানুষকেই জীবিত রাখছেন। আল্লাহর পালনকারিতার অপূর্ব আরেক নিদর্শন এখানে প্রকাশ পেয়েছে। মানুষ যদি একটু চিন্তা করে তবে সহজেই তা অনুধাবন করতে পারে।

আরবীতে হৃদযন্ত্রকে ‘ক্বলব’ (قلب) বলে। এই ক্বলব ‘অন্তকরণ’, ‘অনুধাবনের স্থান’, ‘আধ্যাত্মিক কেন্দ্র’ ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ক্বলবের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। একটি সহীহ হাদীসে আছেঃ

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

-“নিশ্চয় শরীরের মধ্যে এক টুকরো মাংস আছে, যখন এটি ঠিক হবে সমস্ত দেহটিই ঠিক হয়ে যাবে। আর এই মাংসখণ্ড খারাপ হয়ে গেলে সমস্ত দেহটিই খারাপ হয়ে যাবে। আর এই মাংস খণ্ডটির নামই হলো ‘ক্বল্ব’ (হৃদযন্ত্র)” [সহীহ বুখারী]।

উক্ত হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হলো যে, মানুষের হৃদযন্ত্র শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি যাবতীয় মানবিক কল্যাণ ও উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আজকের বিজ্ঞানও একই জিনিস আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে।

(ঝ) বিজ্ঞান এখনো যা বুঝাতে পারে নি

এপর্যন্ত বিজ্ঞান সম্পর্কে যাকিছু বলা হলো, তাতে একথা মনে করা উচিত নয় যে, এ জ্ঞানের মাধ্যমে জগতের সবগুলো দৃশ্যমান ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব বা দেওয়া হয়ে গেছে। বিজ্ঞান, ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীন যেসব দৃশ্যমান (অর্থাৎ সচরারচ সংঘটিত) বিষয়-বস্তু সম্পর্কে আজো অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে, তার সংখ্যা অনেক। এ ক্ষেত্রে মানুষের সর্বাপেক্ষা নিকটে সংঘটিত ঘটনা, যেমন স্বপ্ন-থেকে বিশ্বজগতের সূচনার কারণ প্রভৃতি জড়িত। দু'একটা দৃষ্টান্তের মাধ্যমেই বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে যাবে।

স্বপ্ন কি?

এ পৃথিবীতে এমন মানুষ নেই, যে স্বপ্ন দেখে না। অথচ এই সচরাচর ঘটিত একটি বাস্তবতাকে বিজ্ঞান কোন সঠিক ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্য এব্যাপারে অনেক হাইপোথেসিস বা ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্তু কেউ এখনো কোন সুস্পষ্ট পাকাপুক্ত প্রমাণ দ্বারা স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি।

বিজ্ঞান যা বলছে তা হলো, স্বপ্ন একটি কাল্পনিক, অনুভূতিলব্ধ, চিন্তা-প্রক্রিয়া যা নিদ্রাকালে দেখা যায়- তবে নিদ্রা এবং স্বপ্ন এ উভয়েরই সঠিক কোন সংজ্ঞা দেওয়া যাবে না। স্বপ্নকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে গবেষণা করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে, মানুষ ঘুমান্তাবস্থায় যে কোন সময় তা দেখা যেতে পারে। যদিও স্বপ্ন সংঘটিত হয়, কিন্তু সর্বদাই আমরা তা **দেখি** না। যারা জন্মান্ধ তাদের স্বপ্ন কিছুটা ভিন্ন হয়ে থাকে।

স্বপ্নের ব্যাপারে আরো কিছু আইন-কানুন পরিলক্ষিত হয়। যেমনঃ স্বাভাবিকভাবে দৌড়া যায় না, নিজেকে বেশ হালকা মনে হয়, বাতি জ্বালানো যায় না প্রভৃতি। আরেকটি চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হলো, স্বপ্ন থাকাবস্থায় মানুষের চোখ দুটো অনবরত ঘুরতে থাকে। কোন কোন সময় দেখাগেছে স্বপ্নের কিছু ক্রিয়া যেমন- কিছু ধরা

বা ছোঁয়া বাস্তবে ঘুমান্তাবস্থায়ই অজ্ঞাত থেকেও হাত-পা দিয়ে নড়াচাড়া করে সেসব **দেখা** ক্রিয়া করে যাচ্ছে। অর্থাৎ কিছু ধরার জন্য হাত-পা নড়তে থাকে।

বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, একজন মানুষ তার জীবনে গড়ে ১ লাখ ৩৬ হাজারটি স্বপ্ন দেখে থাকেন। স্বপ্নের সময় মানুষের হার্ট-রেট, শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তচাপ, পেশীর নড়াচড়া, অক্সিজেন গ্রহণ প্রভৃতি দেহের প্রক্রিয়াও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। স্বপ্নাবস্থায় মানুষের দেহের পেশীগুলোও অচেতন হয়ে যায়। এতে স্বপ্নে-দেখা দৌড়াদৌড়ি করাও মানুষের জন্য অসম্ভব হয়ে যায়। কিন্তু কোন কোন মানুষের ক্ষেত্রে পেশী অবশ হয় না, তাই তারা সময় সময় স্বপ্নে চলতে পারে (ড্রিম ওয়াকিং)। অর্থাৎ স্বপ্নের মধ্যে থাকাবস্থায় বাস্তবে বিছানা থেকে ওঠে বেশ দূর পর্যন্ত চলতেও দেখা যায়।

বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, মানসিক ও শরীরবৃত্তিক কারণে স্বপ্ন মানুষের জন্য জরুরীও বটে। তবে এর কারণ জানা যায় নি। স্বপ্ন সম্পর্কে আরোও অনেক কথা শোনা যায়। তবে আসল ব্যাপার হচ্ছে, এ সম্পর্কে সঠিক কোন ব্যাখ্যা এখনো পাওয়া যায় নি। কিছু কিছু স্বপ্ন আছে, যেগুলো পরবর্তীতে সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে যায়। এরূপ কেন হয়, তা বিজ্ঞান বলতে পারে নি।

বাস্তবে স্বপ্ন হচ্ছে আধ্যাত্মিক ব্যাপার-স্যাপার। আর বিজ্ঞান যতোক্ষণ পর্যন্ত আত্মা বলতে যে কিছু আছে, তা স্বীকার না করবে ততোক্ষণ পর্যন্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা পুরোপুরি করতে পারবে না। আর এখানেই সমস্যা। কারণ, আত্মা ও আত্মাকে নিয়ে গবেষণা, এগুলো বিজ্ঞানের গণ্ডীসীমার বাইরে অবস্থান করে। তবে মজার কথা হলো, বিজ্ঞান যদিও আত্মাকে চেনা বা জানার ক্ষেত্রে অপারগ তথাপি আগেকার দিনের মতো **এখন আর বলছে না, বিজ্ঞান দ্বারা যা পরীক্ষা করা যায় না, তা কাল্পনিক বা এর অস্তিত্ব নেই**। এখন বরং এটাই **বিজ্ঞান স্বীকার করে নিয়েছে, রূহ, আধ্যাত্মিক জগত, ফিরিশতা, বেহেশত, দোযখ, পরকাল- প্রভৃতি হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু এগুলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে জানা সম্ভব নয়**। আর যা জানা সম্ভব নয়, তার অর্থ এই দাঁড়ায় না যে, এ সবকিছুই কাল্পনিক বা এসবের অস্তিত্ব নেই!

আসলে মানবদেহে আল্লাহ পাক অনেক গুপ্ত বস্তু লুকিয়ে রেখেছেন। মানুষ যদি ঈমান রাখে এবং আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়ে ইবাদত করে, নিজেকে নিয়ে, ঈমানের আলোকে চিন্তা-গবেষণা করে, তাবে তার কাছে অনেক রহস্য উদঘাটিত হবে। সে স্বপ্নেরও সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে। স্বপ্ন তো আধ্যাত্মিক জতগের ব্যাপার-স্যাপার। স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মানুষের নিদ্রাকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করেছেন। কিন্তু মরণ হলে যেখানে মানবদেহ থেকে আত্মা চিরবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ঘুমের সময় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে দেহজগত ও আধ্যাত্মিক জগতের মাঝেই বিচরণশীল থাকে। মূলতঃ স্বপ্ন হচ্ছে মানবাত্মার চলাফেরা। আর আত্মা এমন এক বস্তু যা স্থান-কালের ঊর্ধ্বে উঠে যেতেও সক্ষম। সুতরাং কোন কোন ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের ঘটনাবলীও আত্মা জানতে পারে। স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ পাক মানুষকে অনেক সময় হুঁশিয়ারীও দিয়ে থাকেন। স্বপ্নকে আমার মতে এই আধ্যাত্মিক সচেতনতা সহকারে গবেষণা করাটাই হবে সমুচিত। বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা কিছু ব্যাখ্যা বেরিয়ে আসতে পারে কিন্তু পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়।

যা হোক স্বপ্ন সম্পর্কে পবিত্র কুরআন-হাদীস থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নে তুলে ধরছি। এতে আশাকরা যায়, স্বপ্নের গুরুত্ব অনুধাবন হবে।

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্‌সালামকে আল্লাহ তা'আলা স্বপ্নযোগে স্বীয় পুত্র কুরবানীর নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইরশাদ হলো:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

-"অতঃপর সে (ইসমাঈল আ.) যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম তাকে বলল: বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কি? সে বলল: পিতা! আপনাকে যা আদেশ

করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন।” [সূরা সাফ্‌ফাত (৩৭):১০২]

হযরত ইউসূফ আলাইহিস্‌সালাম যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা দীর্ঘদিন পর বাস্তবে রূপদান করে। পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে:

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ

-“যখন ইউসূফ পিতাকে বললেন: পিতা, আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারোটি নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্র আমাকে সিজদা করছে।” [সূরা ইউসূফ (১২):৪]

পবিত্র হাদীস শরীফেও স্বপ্নের উপর বেশ কিছু রিওয়ায়েত পাওয়া যায়। স্বপ্নের প্রকার, ব্যাখ্যা, উদ্দেশ্য ইত্যাদির উপর সহীহ বর্ণনা বিদ্যমান। আমরা নিম্নে চারটি রেওয়ায়েত তুলে ধরছি।

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمْ يَبْقَ مِنْ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শোনেছি, তিনি বলেন, “নবুওয়ত শেষ হয়ে গেছে তবে ‘মুবাশ্‌শিরাত’ থাকবে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, ‘মুবাশ্‌শিরাত’ কি? তিনি উত্তর দিলেন, নেক স্বপ্ন” [সহীহ বুখারী]।

عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنْ اللهِ وَالْحُلُمُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ

-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কাতাদাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “সত্য ও বাস্তব স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে, মিথ্যা ও অবাস্তব স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তাই কেউ যখন মিথ্যা ও অবাস্তব স্বপ্ন দেখে এবং তাতে ভয় পায়, তখন যেনো বামদিকে থুথু ফেলে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট এর অনিষ্ট থেকে পানাহ চায়। নিশ্চয় শয়তান কোন ক্ষতি করতে পারবে না” [সহীহ বুখারী]।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ

-হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “মু'মিনের সত্যস্বপ্ন নুবুওয়াতের ৪৬ ভাগের ১ ভাগ” [সহীহ বুখারী]।

عن عليّ قال: تخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعه فى الجسد ◉ فبذلك يرى الرؤيا ◉ فإذا انتبه من النوم عاد الروح إلى جسده بأسرع من لحظة

-ইমাম বাগাভী রাহামাতুল্লাহি আলাইহি তাফসীরে বাগাভীতে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বর্ণিত একটি রিওয়ায়েত তুলে ধরেছেন: হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, “ঘুমন্তাবস্থায় মানুষের রূহ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবে শরীরের সঙ্গে তার নূরের একটি সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। এর মাধ্যমেই মানুষ স্বপ্ন দেখে। জাগ্রত হয়ে ওঠলেই তা দেহের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করে।” [তাফসীরে বাগাভী, সূরা জুমারের ৪২ নং আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে]

বুদ্ধি ও চিন্তার মূলে কি আছে

বিজ্ঞান বুদ্ধি বা ইন্টেলিজেন্ট সম্পর্কে কি বলে? খুব একটা বেশী নয়। বুদ্ধি, চিন্তা, সৃজনশীলনা প্রভৃতি মূলত দর্শন জগতের ব্যাপার। আর মানবতৈরী দর্শনগুলো নানামুখী। কেউ এখনো কোন সর্বজনবিদিত মহাসত্য দার্শনিক থিওরী দিতে সক্ষম হন নি। তবে বুদ্ধি ও চিন্তার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান কিছুটা থিওরী উপস্থাপন করেছে। আমি সংক্ষেপে এগুলো নিয়ে আলোচনা করছি।

আল্লাহর পালনকারিতার আওতায় মনুষ্য বুদ্ধি-চিন্তা-সৃজনী শক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু, তা বলার উপেক্ষা রাখে না। মানুষের মধ্যে এসব গুণাবলী থাকায়ই সে মানুষ নামের অধিকারী হয়েছে। জগতে প্রতিনিয়ত সামাজিক, আর্থিক, মানসিক, প্রযৌক্তিক উৎকর্ষ, সংস্কার ও বিবর্তন ঘটছে। মানুষ এসব গুণাবলীর ফলেই মহাকাশ পাড়ি দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কোন এক সময় বুদ্ধিকে বিজ্ঞানীরা একটিমাত্র বস্তু হিসেবে ভাবতেন। কিন্তু পরবর্তীতে পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে যে, বুদ্ধি মূলতঃ একাধিক বস্তুসমূহের সমন্বয়ে গঠিত। যেমনঃ কোন এক ব্যক্তির স্মরণশক্তি, কথাবলা, চিন্তা করার ক্ষমতা প্রভৃতি জিনিষ থেকে বুদ্ধির উৎপত্তি ও তারতম্য ঘটে।

কে কতটুকু ইন্টেলিজেন্ট তা পরীক্ষা করে দেখারও উপায় আছে। যদিও এ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা-নিয়ে বিতর্কও হয়ে থাকে। এ পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষের বয়স ও কোন বুদ্ধিসম্পন্ন কার্য সমাধান করার ক্ষমতা, এ দু'টি গবেষণা করা হয়। অল্প বয়সে যদি কেউ পরিণত বয়সের লোকদের মতো কাজ সেরে নিতে পারে তবে তার রেজাল্টের মাত্রা হবে বেশী। এ উপায়ে বুদ্ধিকে মাপা ইন্টেলিজেন্ট কৌশিয়েন্ট বা **আইকিউ** বলে। এ আইকিউ যার যতো বেশী হবে সে ততো বেশী বুদ্ধিমান হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। আইকিউ টেস্টের মাধ্যমে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে এর মাত্রা ৪০ (বোকা?) থেকে ১৬০ (সুপার ইন্টেলিজেন্ট) পর্যন্ত হয়ে থাকে।

বিজ্ঞান ইন্টেলিজেন্ট বা বুদ্ধি সম্পর্কে এটুকুই বলেছে। আরো দু'একটা বিষয় নিয়েও গবেষণা হয়ে থাকে, যেমনঃ মগজের আয়তন, পারিপার্শ্বিকতা, বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত (জিনের মাধ্যমে) প্রভৃতি। কিন্তু আসলে এই বুদ্ধি যে কী, তা বিজ্ঞান ব্যাখ্যা দিতে পারছে না। অথচ স্বয়ং বৈজ্ঞানিক চেতনাসহ এ জগতের অনেককিছুই সংঘটিত হচ্ছে এই বুদ্ধি-চেতনার কারণেই। বিজ্ঞান বুদ্ধিকে চিনতে না পারলেও এটা যে আছে, তা অস্বীকার করতে পারছে না। এটা অস্বীকার করলে তো বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করা হবে, নয় কি?

অন্যদিকে দর্শন বুদ্ধি সম্পর্কে নানাকথা বলে। এ প্রসঙ্গে দর্শন নিয়ে গভীর গবেষণা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তাই কিছু না বলেই শুধু এটুকু উক্তি করছি, দর্শনও বিজ্ঞানের মতোই **'রেশন্যাল'** বা যুক্তির মাধ্যমে মানুষের মধ্যে প্রভুর গুণাবলীর সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোৎকৃষ্ট এ বুদ্ধি নামক জিনিসটি, ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা যুগে যুগে করে আসছে। কিন্তু আসল সত্য থেকে এ প্রচেষ্টা দূরেই পড়ে আছে। এর কারণ হলো, যুক্তি-চিন্তার আওতাভূক্ত অহির্জ্ঞান না থাকা। অহির্জ্ঞান ছাড়া এই অদেখা মানবিক গুণাবলী কিছুতেই উদঘাটিত হবার নয়।

আমরা জানি হীরা দ্বারা হীরা কাটা সম্ভব। কিন্তু তাই বলে হীরা দিয়ে হীরাকে জানা কী সম্ভব হতে পারে? মানুষ মূলতঃ বুদ্ধি দিয়ে বুদ্ধির সংজ্ঞা জানতে চাচ্ছে। অথচ বুদ্ধি যেখান থেকে প্রদান করা হলো, সে বিষয় খেয়াল রাখে না! আমার মতে বুদ্ধি-চিন্তা-বিবেক প্রভৃতি বুঝতে হলে এসব বস্তুর মূলে যে স্বয়ং প্রভুর দান নিহিত আছে, তা ভালকরে বিশ্বাস ও অনুধাবন করেই গবেষণা চালালে সুফল বেরিয়ে আসবে।

একমাত্র প্রভুই মহাসত্য, সুতরাং তাঁকে রেখে, তাঁর দেওয়া ওহিরজ্ঞানকে উপেক্ষা করে সত্যপোলব্ধি ঐ হীরা দ্বারা হীরাকে চেনার মতোই মনে হয়। মূলতঃ ইমানুয়েল কান্ট যে বলেছেন, **মানুষ সবকিছু একমাত্র যুক্তি, ইন্দ্রিয় ও অভিজ্ঞতা থেকেই জানতে পারে**, এ কথাটি আসলে সত্য নয়। জানার ক্ষেত্রেও মানুষের সীমাবদ্ধতা আছে।

বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ গবেষণা করে জীবন দিয়েছে, কিন্তু একমাত্র অহিরজ্ঞানকে উপেক্ষা করায় তাদের সারাজনমের চেষ্টা-সাধনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। এবার চিন্তা করুন, যারা অহিরজ্ঞান ছাড়াই বড় জ্ঞানী হিসেবে জগতে পরিচিত হয়েছেন, তাদের সবাইকে কেন বলা হয়, অর্ধজ্ঞানী, বধির, বোবা ও অন্ধ বা জ্ঞানপাপী। অহিরজ্ঞান ও মানবীয় যুক্তিচিন্তা এ দুয়ের সমন্বয়েই সহাসত্যের দ্বার উদঘাটন হতে পারে। এরূপ মহাজ্ঞানীই ছিলেন আল-গাযযালী, ইবনে-সিনা, ইবনে-রুশদ, আল-বিরুনী, ইবনে খালদুন, ইবনুল আরাবী, জালালুদ্দিন রুমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ জ্ঞানতাপসগণ।

অহিরজ্ঞানকে উপেক্ষা করে জ্ঞানচর্চা আমার মতে অসাড়, নির্জীব এবং আসল সত্য থেকে অনেক দূরে থাকার সমান। আগেকার দিনের জ্ঞানতাপস বিশেষ করে আল-গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির চিন্তাধারা নিয়ে আমাদের বেশী করে জানা ও গবেষণা করা একান্ত জরুরী বলে মনে করি। অসাড় যুক্তিবাদ, মেটেরিয়ালিজম, ভাববাদ, প্রভৃতি দার্শনিক বাদ-মতবাদ নিয়ে মাথা ঘামাবার আগে এগুলো যে অসম্পূর্ণ ও ক্ষেত্রবিশেষে সত্যবিচ্যুত তা আগেই অনুধাবন করে বিশ্বাসীদেরকে অগ্রসর হতে হবে। এগুলো জানার মাধ্যমে আমরা হয়তো এ সত্যটি অনুধাবন করবো- **আসল সত্য এখনো এসব দর্শন উদঘাটন করতে পারে নি**। বস্তুত এসব থিওরী কখনো আসল সত্যে নিয়ে আমাদেরকে উপনিত করতে পারবে না। বিশ্বজগত ও মানুষের মধ্যে আল্লাহর গুণাবলীর স্বরূপ উন্মোচনে আমারেদকে **অবশ্যই ঈমানী শক্তি নিয়ে ও অহিরজ্ঞান সহকারে অগ্রসর হতে হবে**।

প্রাণ বলতে কি বুঝায়

প্রাণের সংজ্ঞা কি? অভিধানে প্রাণকে লাইফ (জীবন), ভাইটেলিটি (জৈবিক শক্তি), সউল (আত্মা), হার্ট (হৃদয়) প্রভৃতি শব্দাবলী দ্বারা বোঝানো হয়েছে। তবে কথা হলো বিজ্ঞান প্রাণের সংজ্ঞা এভাবে দেয় নি। আসলে বায়োলজিস্টরা পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে অপারগ। যদিও উল্লেখ্য শব্দাবলীর মধ্যে **'সউল'** ছাড়া অন্যগুলোর আলাদা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে।

জীবন্ত কোন কিছুকে (মানুষসহ) বিজ্ঞান তিনটি গুণাবলী দ্বারা পরিচিতি দেয়। আর তাহলো কোন জীবীর মধ্যে (১) শ্বাস-প্রশ্বাস (মেটাবলিজম) ক্ষমতা, (২) বাড়ার ক্ষমতা ও (৩) বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা, এ তিনটি গুণাবলী থাকাতে হবে। অজড় প্রাণহীন বস্তুতে উল্লেখিত যে কোন একটি গুণাবলী থাকতে পারে কিন্তু এর ফলে এগুলোকে জীবন্ত বলা চলে না। মানুষ ও জীবজন্তু ছাড়াও বৃক্ষ-তরুলতাকে জীবী হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। বৃক্ষের মাঝেও উপরোক্ত তিনটি গুণাবলী আছে।

মানুষের জন্মবৃত্তান্ত, বেড়ে ওঠা, খাদ্যগ্রহণ ও বংশবৃদ্ধি নিয়ে ইতোমধ্যে এ প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে। বৃক্ষ কিভাবে ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে শ্বাস-নিশ্বাস গ্রহণ করে তা-ও বলা হয়েছে। বৃক্ষ মাটি থেকেও খাদ্যগ্রহণ করে এবং বেড়ে উঠে। ফুল ও ফলের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি নিশ্চিত করে।

প্রাণকে এই তিনটি গুণাবলী দ্বারাই যদি সংজ্ঞা দেওয়া হয়, তবে কিন্তু ভুল হবে। কারণ প্রাণের সাথে চেতনা জড়িত। আর চেতনার সাথে আত্মা জড়িত। প্রাণের সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে গেলে এসব বস্তুরও ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে আত্মা, চেতনা, বুদ্ধি, বিবেক প্রভৃতি বস্তু নিয়ে বিজ্ঞান সঠিক কোন গবেষণা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এখানে বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা পরিষ্কার। আল্লাহ পাক মানুষকে মূলতঃ আত্মা দান করেই চেতনাশীল করেছেন, প্রাণী হিসেবে পৃথিবীতে বিচরণশীল জীবী বানিয়েছেন। এটা আল্লাহর রব্বুবিয়তের বিকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পাক কালামে বলেন:

الَّذِى أَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ
نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ * ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ
لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

"তিনি প্রত্যেক বস্তুকে সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন, তিনি কাদা হতে মানবসৃষ্টি শুরু করেন। তারপর তার (মানবের) বংশবিস্তার করেন (বংশবৃদ্ধির পদ্ধতি) তুচ্ছ তরল পদার্থের সার হতে (বীর্য)। তারপর তিনি তাকে (মানুষকে) ভারসাম্য রক্ষা করে আকৃতি দেন (সুগঠিত করে গড়ে তুলেন) এবং তার মধ্যে তাঁর (আল্লাহর) আত্মা থেকে ফুৎকার করেন (প্রাণ দেন, জীবন দেন); এবং তোমাদের জন্য তিনি কান (শ্রবণেন্দ্রিয়), চক্ষু (দৃষ্টিশক্তি) এবং অন্তকরণ (হৃদয় বা প্রাণশক্তি) প্রদান করেছেন; তেমারা অত্যল্প কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো!" [সূরা সিজ্বদা (৩২):৭-৯]

বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বে অসম্পূর্ণ ফাঁকসমূহ

এ পর্যন্ত বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার আলোচনা যা হয়েছে, তা ছিলো মানুষ ও তার মধ্যে লুকানো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। আমরা দেখেছি মানুষের প্রাণ, বুদ্ধি, চেতনা, চিন্তা, স্বপ্নদেখা, সৃজনীশক্তি, পঞ্চেন্দ্রিয়ের আসল স্বরূপ প্রভৃতির সঠিক ব্যাখ্যা দিতে বিজ্ঞান ব্যর্থ হয়েছে। এসাথে অহিরজ্ঞান-উপেক্ষিত মানবীয় দর্শনও বিফলমনোরথ হয়েছে। মূলত দর্শন বা ফিলোসফি সত্যের ধারেকাছে যেতে সদাসচেষ্ট, অথচ সর্বদাই দূরে অবস্থান করছে। অহিরজ্ঞান (কুরআনের জ্ঞান) এ সন্ধানে যে সহায়ক হবে, এ কথাটা আধুনিক দার্শনিকরা বিবেচনা করতেই যেন নারাজ। ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মের শিক্ষা থেকে জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে আজকের দার্শনিকরা (মূলতঃ ঈমানহীন জ্ঞানীরা) একটি কনভেনশন বা আইন করে নিয়েছেন- যুক্তি ও দার্শনিক গবেষণায় ধার্মিক বিশ্বাস জড়িত হলে তারা তা কিছুতেই গ্রহণ করতে চান না।

জগতের সৃষ্টি নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে দর্শন আজ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকেই গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু এ সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যেও অনেক **‘মিছিং লিংক’** বা ফাঁক আছে। এবার বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বের উপর কিছুটা আলোচনা করে দেখা যাক।

(ক) জগতসৃষ্টির সূচনা

বিজ্ঞানের মতে, আজ থেকে প্রায় ১৫ শতকোটি বছর পূর্বে (কারো কারো মতে ২ হাজার কোটি বছর আগে) এ জগতের সূচনা হয়। এ শুরু হওয়ার মুহূর্তে একটা মহাবিস্ফোরণ ঘটে- যাকে ‘বিগ ব্যাং’ বলা হয়ে থাকে। আসলে বিস্ফোরণ বলা হলেও, এ ঘটনাটি ছিলো মূলত স্থান এর (স্পেইস) জন্ম। বিজ্ঞানীদের মতে এর পূর্বে স্থান বলতে কিছু ছিল না, আর স্থান ছাড়া বস্তু ও সময় বলতে কিছু অস্তিত্বশীল হতে পারে না। সুতরাং এ ঘটনার সাথে স্থান-কাল ও বস্তুর জন্ম হয়। জন্মমুহূর্তে জগতটি অত্যন্ত ঘণবস্তুসম্পন্ন এবং এর তাপমাত্রা ধারণাতীতরূপে বেশী ছিলো।

সৃষ্টিতত্ত্ববিদরা মনে করেন, এই বিগ ব্যাংগের সাথে সাথেই যাবতীয় কণা (বস্তু), এনার্জি (শক্তিসমূহ), সময় ও স্থান সৃষ্টি হয়। এ হচ্ছে সৃষ্টিমুহূর্তের কথা। এর পূর্বে কি হয়েছিল বা কোন্ কারণে এ বিস্ফোরণ ঘটলো এসম্পর্কে বিজ্ঞান কিছুই সুস্পষ্টভাবে বলতে পারছে না। যা বলছে তাহলো, ‘এর পূর্ব একটি ব্যাখ্যাহীন ধারণা’। কারণ সময়ের পূর্বে কোনো সময় নেই, সুতরাং সেসম্পর্কে প্রশ্ন করাও অর্থহীন। আর কোন্ কারণে সেই বিস্ফোরণ ঘটলো? এ প্রশ্নের জবাবে বিজ্ঞানীরা সেই সময় নিয়েই জবাব দেন। তারা বলেন, যেহেতু বিস্ফোরণের আগে সময় বলতে কিছু ছিলো না, তাই কোন্ কারণে তা হয়েছে এ প্রশ্নও অনর্থক! কিন্তু প্রশ্ন তো থেকেই যায়।

পাঠকরা এখানে বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার স্বরূপ লক্ষ্য করুন। কোন এক মহাশিক্তিধর প্রভু এ বিস্ফোরণের কারণ ছিলেন, বা তাঁর ইচ্ছায় তা হয়েছে এ কথাগুলো বিজ্ঞান বলতে নারাজ। এর কারণ কি? কারণ হলো, যদি তা বলা হয়, তবে বিজ্ঞান বাধ্য হয়ে ধর্মবিশ্বাসকে গ্রহণ করতে হবে। কার্যকারণ নীতিতে বিজ্ঞানও বিশ্বাসী। অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রিয়ার পেছনে এক বা একাধিক কারণ থাকে। এটাই হলো 'কার্যকারণ নীতি'। অথচ এ মৌলিক প্রশ্নে এসে বিজ্ঞান তার নিজস্ব একটি আইনকে অমান্য করতে বাধ্য হয়েছে। তাহলে, বিজ্ঞানী হয়েও আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপন করায় কোন ক্রটি নেই, এ কথাটি আজ বিজ্ঞানকে গ্রহণ করে নিতে হচ্ছে। এবার দেখা যাক সৃষ্টিতত্ত্বের বাকী অংশ কি বলে।

(খ) গ্রান্ড ইউনিফিকেশন ইপোক বা মহা-একক সময়

সৃষ্টি মুহূর্তের অত্যল্প সময়ের মধ্যে কিসব কাণ্ড ঘটেলিছ তা-ও বিজ্ঞান জানে না। তবে খুব দ্রুত স্থান বর্ধিত হচ্ছিলো। এ ক্রমবর্ধমান স্থানের মধ্যে অত্যন্ত বেশী এনার্জি সহকারে একটি পার্টিকেল (কণা সম্বলিত) সুপ বা ধূয়া ছিলো। এই সুপের মধ্যে কণা ছাড়াও এ্যন্টিপার্টিকেল (বিপরীত কণা) জন্ম নেয়। পাঠকরা আগেই এই এ্যন্টিপার্টিকেল সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। এসময় এনার্জি বা উদ্যম পার্টিকেলের মধ্যে এতো বেশী ছিলো যে, মূলত যাবতীয় বস্তু ও শক্তি একই সাথে অবস্থান করছিলো। এই ক'টি ক্ষণকে বিজ্ঞানীরা গ্রাণ্ড ইউনিফিকেশন ইপোক বা মহা একক সময় বলে আখ্যায়িত করেছেন। এসময় বস্তু ও স্বাভাবিক শক্তিসমূহ সবকিছু একত্রে অস্তিত্বশীল ছিলো। এসময় প্রাকৃতিক চারটি শক্তিসমূহের (এ সম্পর্কে ইতোমধ্যে আলোচনা হয়েছে) তিনটিই (শক্তিশালী ও দুর্বল আনবিক শক্তি এবং বৈদ্যুতিক চুম্বকীয় শক্তি) একত্রে ছিলো। তবে মহাকর্ষ এ ইপোক শুরু হওয়ার সময় আলাদা হয়ে যায়।

সময় বৃদ্ধির সাথে বিশ্বটি দ্রুত বর্ধিত হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে এর তাপমাত্রা অনেকটা কমে আসে। এ হচ্ছে বিশ্বসৃষ্টির প্রাথমিক স্তর। এ ব্যাখ্যায় কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন থেকে যায়, যার সঠিক উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারছে না।

প্রথমতঃ বিস্ফোরণের কারণ কি? কোন্ মহাশক্তি এ বিস্ফোরণ ঘটালো? এর একমাত্র জবাব হচ্ছে, অসীম শক্তিধর এক আল্লাহই এর কারণ।

দ্বিতীয়তঃ স্থানের জন্মের সাথে বস্তু আস্‌লো কোত্থেকে? এ প্রশ্নের জবাবও বিজ্ঞান জানে না। এক্ষেত্রেও বলতেই হয়, বস্তুর অস্তিত্ব একমাত্র আল্লাহই দিয়েছেন।

তৃতীয়তঃ গ্রাণ্ড ইউনিফিকেশনের কালে যে চারটি মৌলিক শক্তি (স্বভাবের আইনের মূল) সৃষ্টি হলো, তা কেন হলো? এবং কিভাবে হলো? এগুলো না হয়ে অন্য কিছু হলো না কেন? এগুলোর মধ্যে যেসব গুণাবলী আছে তার পেছনে কি আছে? এখানে অবশ্যই বলতে হয়, এ হচ্ছে আল্লাহর রব্বুবিয়াত বা জগতকে পালন করার পদ্ধতিসমূহ। আর অবশ্যই তিনি যদি চাইতেন এরূপ নেচারেল আইন-কানুন না করে অন্যভাবে করার, তবে তিনি পারতেন। বিজ্ঞান যে বস্তুজগতের শক্তিসমূহ ও আইন-কানুন নিয়ে শুধু গবেষণা চালাতে পারে আর এর আসল কারণ তা জানতে পারে না, এসব প্রশ্ন থেকে সেটা স্পষ্ট নয় কি?

(গ) ইনফ্লেশন স্টেজ বা স্ফীতি হওয়ার কাল

সৃষ্টির কয়েক মুহূর্ত পরেই বিশ্বটা ইনফ্লেশন স্টেজে উপনিত হয়। একটা বেলুনকে বাতাস দিয়ে যেভাবে স্ফীত করা হয় ঠিক তদ্রূপ বিশ্বটা দ্রুত স্ফীত হতে থাকে। আগের তুলনায় তাপমাত্রাও অনেকটা কমে আসে (তবে এটাও আমাদের ধারণাতীত। নাম্বার দশের সাথে সাতাশটি শূণ্য যোগ করলে যে বিরাট অঙ্ক হয়, তাপমাত্রা তখনো সেরূপ জঘন্য ছিলো।) এটা ছিলো এক বিশেষ ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রা। এমসয় কিছু মৌলিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। পানি যেরূপ ঝিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় নেমে আসলে বরফে রূপান্তরিত হয়ে যায়, এরূপ বিশ্বটাও হঠাৎ মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়।

বস্তুর শক্তিশালী আনবিক ফোর্স (স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স) অন্যগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে বিরাট অঙ্কের এনার্জি রিলিজ হয়। তারপরই একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে। সমগ্র বিশ্বটা মাত্র ক্ষণকালের মধ্যেই জ্যাতিমিক হারে স্ফীত হয়ে

যায়। এই একটি মাত্র ক্ষণে (বাস্তবে এই ক্ষণটির মাত্রা ছিলো একসেকেণ্ডের কোটি কোটি অংশের একটি অংশ মাত্র!) বিশ্বটা কোটি কোটি গুণ বর্ধিত হয়ে যায়।

এই ইনফ্লেশন ইপোক সংঘটিত হওয়ার পরে, বিশ্বের গতি-মতি অনেকটা স্তিমিতি হয়। তবে বিশ্বের বিস্তৃতি অব্যাহত থাকে, যদিও তা অনেকটা ধীর গতিতে হচ্ছিলো। অবশ্য এ বিস্তৃতি আজো হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা এর প্রমাণ আবিষ্কার করেছেন।

বিশ্বজগত যে ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হচ্ছে তা পবিত্র কুরআনেও উল্লেখিত আছে। আল্লাহ পক ইরশাদ করেন:

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

"এবং আমিই (আল্লাহ) আকাশমণ্ডল (বিশ্বজগত) সৃষ্টি করেছি স্বীয় ক্ষমতায়; এবং অবশ্যই, আমি ক্রমান্বয়ে তা বর্ধিত করছি।" [সূরা জ্বা-রিয়াত (৫১):৪৭]

(ঘ) পার্টিকেল বা পরমাণু সৃষ্টির কাল

প্রাচীন যুগে ডিমোক্রিটাস [খ্রি.পূ. ৪৬০-৩৭০] নামক এক গ্রীক বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম অণু বা এটমের ধারণা করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক যুগে বিজ্ঞানীরা স্বভাবের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম পার্টিকেল অণুকে মনে করেন না। তারা বলছেন, ১২টি ভিন্ন পার্টিকেল হচ্ছে বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ। এদের ছ'টিকে ক্যুয়ার্ক এবং বাকী ছ'টিকে লেপটন নামকরণ করা হয়েছে। প্রথম ছটি দ্বারা এটমের কেন্দ্রীয় কণা প্রোটোন সৃষ্ট হয়েছে এবং বাকী ছ'টি দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে নিউট্রন (এটমের দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কণা)। এগুলো সৃষ্ট হয় জগতসৃষ্টির মাত্র ক্ষণকাল পরে। এ সময়কে বিজ্ঞানীরা পার্টিকেল ইপোক বলেছেন।

(ঙ) অণুর জন্মকাল

জগতসৃষ্টির মাত্র ১ সেকেন্ড পরে সব অণু সৃষ্টি হওয়া শুরু করে। এগুলো সৃজন হতে মাত্র ১০০ সেকেন্ড সময় অতিবাহিত হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় এ ইপোককে নিউক্লিওসিনথেসিস ইপোক (অণুর কেন্দ্রসৃষ্টির কাল) বলা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞান মনে করে সাধারণ হাইড্রোজেন এটম সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয় নি, এটা আগে থেকেই ছিলো! এটা বিজ্ঞানের একটি অদ্ভুত আবিষ্কার বৈকি।

সৃষ্টির ১০০ সেকেন্ড পর তাপমাত্রা অনেকটা কমে আসে, যার ফলে এটমের কেন্দ্রের কণাগুলো (নিউট্রন ও প্রটোন), একত্রে থাকতে সক্ষম হয়। বেশী তাপমাত্রা হলে এগুলো '**ফটোন**' নামক কণার আক্রমণে বিভক্ত হয়ে যেতো।

এক্ষেত্রে বেশী টেকনিক্যাল জটিলতায় না গিয়ে এটুকু বলা যায় যে, সৃষ্টির মাত্র ১০০ সেকেন্ড পরই স্বভাবের সর্বাপেক্ষা বেশীরভাগ পদার্থ হাইড্রোজেনের জন্ম হয়। এ হাইড্রোজেনই বিশ্বজগতের অগণিত তারার ইন্ধন হিসেবে কাজ করছে। আমাদের সূর্যের মধ্যেও ৯৮% হাউড্রোজেন আছে। মূলত জগতজুড়ে হাইড্রোজেনের মাত্রাও মোট পদার্থের ৯৮%।

এই হাইড্রোজেন সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহর পালনকারিতার একটি পদ্ধতি প্রকাশ পেয়েছে। হাইড্রোজেন দ্বারা পরবর্তীতে সৃষ্ট জগতের অসংখ্য তারাকে জ্বলন্ত করা হয়েছে এবং এ থেকে বিশ্বব্যাপী আলো ও এনার্জি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে সৃষ্টির শুরুতেই জগতে আলো তৈরী করতে মহাপ্রভু হাইড্রোজেন নামক গ্যাস সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কালামে ইরশাদ হয়েছেঃ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

"যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো। তথাপি কাফিররা স্বীয় পালনকর্তার সাথে অন্যান্যকে সমতুল্য স্থির করে!" [সূরা আনআম (৬)ঃ১]

আলো কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে, তা এখন আমরা জানতে পেরেছি। তবে প্রাথমিক অবস্থায় যেহেতু যাবতীয় পদার্থ একত্রে 'সুপ' বা একটিমাত্র খণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো তাই প্রথমে শুধু আলোই ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে তারা ও তারাজগতের (গ্যালাক্সি) জন্ম হয় এবং এগুলো একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। তারাগুলো ও তারাজগতের মধ্যে এই দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ায় অন্ধকার সৃষ্টি হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, শুধু আলো থাকলে যেমন হতো না, তেমনি শুধু অন্ধকার থাকলেও সামঞ্জস্য বজায় থাকতো না। আল্লাহ পাক এই আলো-আঁধার সৃষ্টি করে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। এটা আল্লাহর রব্বুবিয়তের অপূর্ব এক পদ্ধতি।

(ছ) বিচ্ছিন্নতার শুরু

বিজ্ঞানের মতে সৃষ্টির (বিং ব্যাংগের) তিন লক্ষ বছর পর থেকে প্রাথমিক 'সুপ' আলাদা হওয়া শুরু করে। এসময় তাপমাত্রা কমে তিন হাজার কেলভিনে নেমে আসে। এবার বর্ধিত বিশ্বের সর্বত্র মেটার বা জড় বিচ্ছিন্ন হওয়া আরম্ভ করে। এই ইপোক বা যুগকে '**রিকমবিনেশন ইপোক**' বা পূণর্মিলন কাল বলা হয়। বিশ্ব এ অবস্থায় ১০ লক্ষ বছর ছিলো। এসময় জগতের বিভিন্ন অংশে মধ্যাকার্ষণের ফলে জড়বস্তু একত্রিত হয়ে তারা, তারাজগত, মহাতারাজগ ও মহা-মহাতারাজগত সৃষ্টি হওয়া শুরু হয়। এর পর থেকেই আমাদের সৌরজগত ও পৃথিবীসহ গ্রহ-উপগ্রহগুলোর জন্ম প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে।

একটিমাত্র প্রাথমিক ম্যাস বা জড়বস্তুর সমন্বয়ে সৃষ্ট জগতটা যে পরবর্তীতে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল এ তথ্য পবিত্র কুরআন থেকেও পাওয়া যায়। আল্লাহ পাক তাঁর কালামে অবিশ্বাসীদের প্রতি প্রশ্ন করে বলেন:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

-"অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, মহাবিশ্ব ও যমিন (শক্ত গ্রহগুলো) (একত্রে) জড়ানো ছিলো (সুপ); পরে আমি এগুলোকে পৃথক (বিচ্ছিন্ন) করেছি এবং পানি দ্বারা প্রত্যেক প্রাণবান বস্তু পয়দা করেছি; এর পরেও কি ওরা (অবিশ্বাসীরা) ঈমান আনবে না?" [সূরা আম্বিয়া (২১):৩০]

এখানে উল্লেখ্য যে মানুষসহ যাবতীয় প্রাণীরা মূলত পানি থেকেই সৃষ্ট। আমাদের দেহের বিল্ডিং ব্লকস্ নামে খ্যাত কোষগুলো ৮০% পানি থেকে তৈরী।

তাহলে অবিশ্বাসীরা আজ বিজ্ঞানের মাধ্যমে দেখে নিয়েছে আল্লাহর এই পবিত্র বাক্যের সত্যতা। এবার কি তারা ঈমান আনবে? আল্লাহ পাক অবিশ্বাসী ও সন্দেহবাদীদের মধ্যে ঈমানের আলো দান করুন, এটাই কামনা।

অত্যন্ত সংক্ষেপে জগতসৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখানে উপস্থাপন করেছি। এব্যাপারে এ প্রসঙ্গে আরোও কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

একটা জিনিসের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাই। উপরের বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্বসৃষ্টির ক্ষেত্রে ছ'টি আলাদা মৌলিক ইপোক বা যুগ ছিলো। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনেও এরূপ ছ'টি যুগের কথা উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ...

"আপনার প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ, যিনি ছ'দিবসে মহাবিশ্ব ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।..." [সূরা আরাফ (৭):৫৪, অংশ]

এ আয়াতে এবং আরোও বহু আয়াতমালায় **'সিত্তাতে আইয়্যাম'** শব্দদ্বয় এসেছে। এই আইয়্যামের সাধারণ অর্থ দিবস হলেও মূলত এর আসল ব্যাখ্যা হচ্ছে, ৬টি

স্টেজ বা ইপোক বা যুগ। এর কারণ হলো, অন্যত্র আল্লাহ পাক তাঁর এক দিবসকে আমাদের হিসাবে হাজার বছর বা পঞ্চাশ হাজার বছর বলেছেন। [সূরা সাজদাহ (৩২):৫, সূরা মাআরিজ (৭০):৪ দ্রঃ]

সুতরাং এই সিত্তাতে আইয়্যাম বলতে ৬টি অনির্দিষ্ট ছোট-বড় কালকেই বুঝাচ্ছে। আর আমরা ইতোমধ্যে বিজ্ঞানের ভাষায় এ ৬টি ইপোক নিয়ে আলোচনা করেছি। এ ইপোকগুলো মৌলিক ছিলো।

আল্লাহ পাক তাঁর রব্বুবিয়তের আওতায় জগতটি যে ৬টি যুগে সৃষ্টি করেছেন একথা আজ বিজ্ঞানই প্রমাণ করেছে। সুবহানাল্লাহ! বিজ্ঞানীদের পক্ষে ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া কি অন্য কোন পথ খোলা আছে? একমাত্র ইসলামের ঐশীজ্ঞানই যে তাদের আবিষ্কারের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে যাচ্ছে, একথা কি আজ আর কেউ অস্বীকার করতে পারবে? কখনই নয়।

"তিনি আকাশেও মা'বুদ এবং পৃথিবীতেও মা'বুদ; এবং তিনিই মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞাত।" [সূরা যুখরুফ (৪৩): ৮৪]

উপসংহার

রব্বুবিয়াতের ব্যাপক অর্থ আদি-অনন্ত পালনকারিতা

(ক) জগতটি যান্ত্রিক নয়

আল্লাহর রব্বুবিয়াত নিয়ে আগের পরিচ্ছেদে বর্ণিত দীর্ঘ আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, এ মহাবিশ্বের প্রতিটি অণু থেকে যাবতীয় বস্তুজগত প্রভু প্রদত্ব নির্দিষ্ট কিছু নিয়মমাফিক পরিচালিত। প্রকৃতি নিজে তার আইন-কানুন সৃষ্টি করেনি এবং খাম-খেয়ালীভাবে কোন ঘটনাও ঘটছে না।

প্রকৃতিবাদী তথা বস্তুবাদীরা স্বভাবকে (নেচারকে) জগতের সৃষ্টি, ঘটনাবলী, বিবর্তন, পরিবর্তন প্রভৃতির জন্য একটি মেশিনের মতো ক্রিয়াশীল স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে মনে করে। অথচ এরূপ ধারণা যে সম্পূর্ণ ভুল তা আমরা ইতোমধ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সীমাবদ্ধতা ও অনিশ্চয়তার বাস্তবতা থেকে প্রত্যক্ষ করলাম।

সবকিছুর পেছনে যে একটি সক্রিয় শক্তি নিহিত আছে যা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সিস্টেমেটিক গবেষণার বাইরে, তা আজ আর অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আর এ শক্তিই হচ্ছে আল্লাহর রব্বুবিয়াত বা পালনকারিতা। ব্যাপক অর্থে রব্বুবিয়াত হচ্ছে সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্বভাব এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছু পরিচালনা। মূলত প্রাকৃতিক প্রতিটি ক্রিয়ার সাথে জড়িত এই পালনকারিতা যার মূলে আছে অলৌকিকতা। এককথায়, যাবতীয় ঘটনাই মৌলিকভাবে অজানা অদৃশ্য জগত থেকে উৎপন্ন হয়ে বাহ্যিক মহাবিশ্বে প্রকাশ

পায়। বিজ্ঞান তার নিজস্ব গণ্ডীসীমায় থেকে বাহ্যিক ক্রিয়ার ব্যাখা-বিশ্লেষণ করে মাত্র, এর আসল কারণ কি তা জানে না।

রেশন্যালিজম বা যুক্তিবাদের মাধ্যমে জগত নিয়ে গবেষণা মোটেই আপত্তিকর নয়। তবে এর সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করতে হবে। যুক্তিবাদের দোহাই দিয়ে বিজ্ঞান দ্বারা প্রভুর অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না- এরূপ যুক্তি উপস্থাপন করা আর গ্রহণযোগ্য হবে না।

যুক্তিবাদ বিজ্ঞানকে কষ্টিপাথর হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু এই কষ্টিপাথর নির্ভেজাল বা খাঁটি কি না সেটা তো আগে যাচাই করতে হবে! বিজ্ঞান নিজেই আজ স্বীকার করেছে, জগত গবেষণায় কোন এক ক্ষেত্রে এসে সে অচল বা অপারগ। তাহলে এই বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্বকে পর্যন্ত অস্বীকার করা যায় কি ভাবে? তবে যুক্তিবাদ দিয়েই কিন্তু আস্তিকতাবাদের প্রমাণ উপস্থাপন করা যায়।

(খ) দর্শন চুড়ান্ত মহাসত্য উদঘাটন করতে ব্যর্থ হয়েছে

দর্শনের ইতিহাস থেকে এটা স্পষ্ট যে, এ জ্ঞানচর্চায় চুড়ান্ত কোন সিদ্ধান্তে আজো উপনিত হওয়া সম্ভব হয়নি। একটি বিশ্বজনিন দার্শনিক মহাসত্য এখনো কেউ উপস্থাপন করেননি। এর কারণ কি হতে পারে? সক্রেটিস, এ্যরিষ্টটল, প্লেটো থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কতো দার্শনিক যে এই ধরায় জন্ম নিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু মহাসত্য আজো দর্শন থেকে অনেক দূরেই পড়ে আছে। কতো ইজম, কতো বাদ আর কতো গবেষক ও মহাজ্ঞানী এ পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করলেন কিন্তু কোথায় সে কাংখিত মহাদর্শন, মহাসত্য? তবে হ্যাঁ, দর্শন মানুষের জীবনকে পরিবর্তিত করেছে, মানবজীবন করেছে কোনো কোনো সময় দুর্বিষহ এবং অত্যল্প ক্ষেত্রে শান্তিময়। কিন্তু দর্শনই মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, এরূপ বললে বিরাট ভুল হয়ে যাবে। মানবীয় ভুল দর্শন-ধারণার মাধ্যমে বিপথগামী মানবগোষ্ঠীকে সুপথে ফিরে আনতে বার বার একটি ঐশীশক্তি ইতিহাসে সদাক্রিয়াশীল আছে। এ শক্তিটি হচ্ছে ধর্ম।

সভ্যতার শুরু থেকে- বাস্তবে মানবসৃষ্টির শুরু থেকেই ধর্ম মানবজীবনে বিরাট এক নিয়ন্ত্রণ-শক্তি হিবেসে কাজ করছে। ধর্মহীন মানুষ এ পৃথিবীতে অত্যল্প বসবাস করেছে। ধর্ম মানুষকে ক'টি মৌলিক চাহিদাও মেটায়। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জরুরী যেটি সেটি হলো আধ্যাত্মিক খোরাক। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পেরেছি, বর্তমান পশ্চিমা ধনাঢ্য সমাজে আধ্যাত্মিক খোরাকের অভাবে অনেকেই হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বস্তুতান্ত্রিক দর্শন-জ্ঞান মানুষের মৌলিক আত্মিক চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ। সুতরাং যে দর্শনে ধর্মের স্থান নেই, সেটি মূলত স্থিতিহীন নড়বড়ে জ্ঞান, বাহ্যিত জ্ঞান-বিজ্ঞানে তা পরিপূর্ণ কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে তার বিচরণ একেবারে নেই। আসলে দর্শনে যদি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণ ঘটে তবেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হতে পারে। প্রভুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে প্রভুর সৃষ্ট জগত নিয়ে গবেষণা করে জ্ঞানার্জন হয় বটে, কিন্তু আসল ঐশীজ্ঞান থেকে বিস্মৃত থাকতে হয়। এককথায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন নিয়ে জ্ঞানচর্চা যদি ঈমানী শক্তি সহকারে সম্পাদিত হয় তবে প্রকৃত জ্ঞানবান হওয়ার সম্ভাবনা উন্মোচিত হতে পারে। অতীতে অনেক জ্ঞানতাপসরা এ উপায়েই জ্ঞানচর্চা করে জগতে চিরন্তন সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সেসাথে পৃথিবীর মানুষের জন্য রেখে গেছেন স্থায়ী কল্যাণ।

(গ) বৈষয়িক উৎকর্ষতা ইতিহাসের স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা

মানবেতিহাস ঘাটালে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইতিহাসের শুরু থেকেই ক্রমান্বয়ে বৈষয়িক দিক থেকে মানুষ উন্নতিসাধন করে আসছে। সুতরাং আধুনিক যুগে পাশ্চাত্যে বৈষয়িক উন্নতিসাধনে ধর্মবিরোধী দার্শনিক চিন্তা-চেতনা ক্রিয়াশীল ছিলো বা আছে তা বলা মোটেই যুক্তিসম্মত নয়। আসলে এ প্রতিক্রিয়ার মূলে ছিলো, ইউরোপীয় চার্চ কর্তৃক বিজ্ঞান-বিরোধী অবস্থান।

মধ্যযুগের শুরু থেকে অষ্টাদশ শতাব্দি পর্যন্ত এই চার্চ বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ সাধনে বাঁধা দিতে থাকে। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবেই চার্চের নিজস্ব ব্রাণ্ডের ধর্মের বিরুদ্ধে রেশনালিজম, যুক্তিবাদ, মেটেরিয়ালিজম, রোমান্টিসিজম প্রভৃতি দার্শনিক ও

অর্থনৈতিক থিওরী আত্মপ্রকাশ করে। অথচ এই একই সময়ে বা পিরিয়ডে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা পুরোদমে হচ্ছিলো অন্যত্র। এই গবেষকরা ধার্মিক ছিলেন। এরা কখানো ধর্ম থেকে বা ধর্ম-বিশ্বাস ধেকে বিজ্ঞানচর্চায় কোন ধরনের বাঁধার সম্মুখীন হন নি।

বিজ্ঞানের এই ধর্ম থেকে মুক্ত গবেষণার ক্ষেত্রটি ছিলো ইসলামী দুনিয়া। ইসলাম এবং এর নিষ্কলুষ সত্যবিশ্বাস এতোই পবিত্র যে, মানবীয় জ্ঞানচর্চায় এটা কোনদিনই বাঁধার সৃষ্টি করে না। কিন্তু দুঃখের সহিত বলতে হয় যে, বর্তমানে কিছু কছু মুসলমান নামধারী চিন্তাশীলরা এ সত্য উপলদ্ধি করতে পারেন না। তারা পশ্চিমা দার্শনিক ভাবনা-চিন্তা নিয়ে অতীতে পশ্চিমারা যেরূপ খস্টবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, এখন ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অপচেষ্টায় মরিয়া হয়ে লেগেছে। অথচ আসল সত্য হলো, বিজ্ঞান ও দর্শনের সাথে ইসলামের সংঘাত মৌলিকভাবে কাল্পনিক। হ্যাঁ, সংঘাত তখনই হয়, যখন প্রগতিবাদের নামে, সেক্যুলারিজমের নামে, ইসলামকে উৎখাত কারার চেষ্টা চলে। দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান মানুষের যেসব মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য চেচামেচি করছে, তা সবই ইসলাম দান করেছে। বৈষয়িক উন্নতিসাধনের জন্য যে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের কথা পাশ্চাত্যবাদীরা বার বার উচ্চারণ করে যাচ্ছেন, তা-ও ইসলামের সাথে সংঘাতময় নয়। বরং ইসলামই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অতীতে বিরাট অবদান রেখে গেছে। তাহলে সমস্যাটা কোথায়?

সমস্যাটা আসলে শিক্ষাক্ষেত্রে। পশ্চিমে যে শিক্ষা আধুনিক যুগের শুরুতেই প্রয়োজনীয় ছিলো, অর্থাৎ খৃস্টবাদের অদ্ভুত মানবতৈরী ধর্ম-বিশ্বাস বিরোধী শিক্ষা- তা আজো আমাদের সমাজে বিদ্যমান। আমাদের বাচ্চাদের এটা শিক্ষা দেওয়া হয় না যে, ইসলামী চেতনা ও বিশ্বাসকে বুকের মধ্যে লালন করেও এ জগতে আমরা আর্থ-মাসাজিক ও নৈতিক দিক থেকে সুসভ্য ও উন্নত জাতি হিসেবে শির উত্তোলন করতে পারবো। এটা শিক্ষা দেওয়া হয় না যে, অতীতে আমাদেরই পূর্বসুরী শত শত বিজ্ঞানী ও জ্ঞানতাপসরা সমগ্র মানবজাতির জন্য অশেষ অবদান রেখে গেছেন। বস্তুত তাদেরকে একথা জানানো হচ্ছে না, “ধর্ম-বিশ্বাস ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে এক অপরূপ সামঞ্জস্য ইসলামে বিদ্যমান।”

মুসলমান নতুন প্রজন্ম এসব সত্য থেকে বঞ্চিত। অবশ্য এর জন্য দায়ি আমাদের তথাকথিত পাশ্চাত্যের বস্তাপঁচা জ্ঞানে জ্ঞানবান মুসলমান নামধারীরাও। এ অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন এখনই আনা জরুরী। শিক্ষাক্ষেত্রে ইসলামী ধর্ম-দর্শন ছাড়া আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। একই সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ অপরিহার্য।

ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক চরিত্র গঠন ও আধ্যাত্মিক খোরাকের যোগান দেওয়া হবে। অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে বৈষয়িক উন্নতিসাধন ও রব্বুবিয়াতের স্বরূপ জানা যাবে। এ দু'টি জ্ঞানের শাখার সমন্বয়ে গড়ে উঠবে এক অপরূপ সামঞ্জস্যতা। এ সামঞ্জস্যতার স্বরূপ আসলে কী তা জানতে হলে যে কোন 'ইসলাম ধর্মে অটল বিশ্বাসী' বিজ্ঞানীর সাথে আলাপ করে দেখুন। ঈমানের অধিকারী বিজ্ঞানীদের চিন্তা-চেতনা উন্মোচিত। আল্লাহর রব্বুবিয়তের অত্যাশ্চর্য পদ্ধতি তাদের সামনে খোলা। এতে তাদের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায়। মনের ভেতর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। মানুষের চিন্তা-চেতনা-প্রাণ থেকে বস্তু জগতের প্রতিটি অণু-কণা যে আল্লাহ পাক নিয়ন্ত্রণ করছেন, একজন বিশ্বাসী বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তা স্বচ্ছ পানির মতো পরিষ্কার, দিবালোকের মতো উজ্জ্বল।

শেষকথা: ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর অপরিসীম কৃপায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামের উপর এই গবেষণামূলক গ্রন্থটির মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সকাশে অল্প-বিস্তর কিছু তথ্যাদি তুলে ধরলাম। বিষয় যেহেতু ব্যাপক, তাই একটিমাত্র গ্রন্থে পুরো তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। এই গ্রন্থটি পাঠকসমাজে যদি সমাদৃত হয় তাহলে আল্লাহর ইচ্ছা হলে এবং আমাকে তিনি হায়াতে বাঁচিয়ে রাখলে হয়তো এ বিষয়ের উপর আরও লেখালেখি প্রকাশ করার উদ্যোগ নেব- আমি আপনাদের সবার কাছে দোয়াপ্রার্থী।

উপসংহারের শেষে মানবতার ভবিষ্যৎ নিয়ে দু'চারটে কথা ব্যক্ত করতে চাই। ঈসায়ী একবিংশ শতকের নতুন ঊষার আলো আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত হয়েছে। বিগত সহস্রাব্দিতে পাশ্চাত্যে উদ্বুদ্ধ ধর্ম-বিরোধী তথা কলুষিত চার্চ-বিরোধী প্রতিক্রিয়ার ফলে মানবজীবনে দুঃখ-দৈন্য-দুর্দশা নেমে এসেছিলো। মধ্যযুগের শুরুতে অন্ধকারকে ভেদ করে চিরন্তন সত্যের আলো আল-ইসলাম জগতে আবির্ভূত হয়ে মানুষকে নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করেছিলো। তারপর পঞ্চদশ শতক থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ইসলামসহ পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মবিশ্বাসে পাশ্চাত্যের উত্থান ও এর প্রতিক্রিয়া বিরাট ক্ষতিসাধন করে। এ ক্ষতির খেসারত আজো পৃথিবীর মানুষ দিয়ে যাচ্ছে। কিন্ত মহাসত্য কখনো চাপা দিয়ে রাখা যায় না। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, দর্শন প্রভৃতি প্রতিটি কোণ থেকে প্রচণ্ড চাপের মুখে একমাত্র ইসলাম ধর্মই শির উত্তোলন করে ঠিকে আছে, থাকবেও। অন্যান্য ধর্মবিশ্বাস বিশেষ করে খস্টবাদ আজ সমূলে ধ্বংস হতে যাচ্ছে। খস্টানরা চাপের ঠেলায় ঐশীগ্রন্থ বাইবেলকে পর্যন্ত পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংস্কার করতে বাধ্য হচ্ছেন। অবশ্য শুরু থেকেই আসল ইঞ্জিল কিতাবকে পরিবর্তন করা হয়েছিলো, এটা এখন ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু হাজার বছরের বুদ্ধিভিত্তিক, প্রযৌক্তিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ষড়যন্ত্রমূলক চাপের সম্মুখে একটিমাত্র ধর্মবিশ্বাস বীরের মতো ঠিকে আছে। প্রতিটি আক্রমণকে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়ে একবিংশ শতকে পদার্পন করেছে। এ ধর্মটিই হচ্ছে ইসলাম। ইসলামই তৃতীয় সহস্রাব্দি এবং পরবর্তী যুগসমূহের একমাত্র ধর্ম।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম এ উন্নতির যুগে যে ধর্মবিশ্বাস সামঞ্জস্য ও শান্তির উৎস দিতে সক্ষম তা হচ্ছে ইসলাম। এটা আশ্চর্যের কিছু নয় যে, বর্তমানে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দ্রুত সম্প্রসারিত ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। ইসলামে কোন অন্ধবিশ্বাসের স্থান নেই। কাল্পনিক তত্ত্ব-বাদ-মতবাদ-প্রতিবাদ নেই। প্রগতিবিরোধী কোন ইলেমেন্ট নেই। নেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে কোন সংঘাত। মানুষের নৈতিক দিক-নির্দেশনা, সুসভ্য সমাজ গঠনের উপাদান, জীবনের মূল্যবোধ, মানবাত্মার আধ্যাত্মিক খোরাক প্রভৃতি মানবিক মৌলিক প্রতিটি চাহিদা একমাত্র ইসলামই সঠিকভাবে যোগান দিতে পারে। ইসলামের

পবিত্র ঐশীসূত্রের সত্যতা আজ সর্বাপেক্ষা কট্টর ইসলামবিরোধীও স্বীকার করে নিয়েছে।

এখন কেউ যদি ধার্মিকতার খোঁজে বের হয় তবে ইসলাম ছাড়া অন্য কোথাও খোঁজার কোন পথ খোলা আছে কি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীর মানুষ একমাত্র ইসলামী জ্ঞান-দর্শন ও ঈমান থেকে সর্বাপেক্ষা বেশি উপকৃত হবে। বৈষয়িক উৎকর্ষ সাধনে মনের শান্তি নিহিত নয়। মনের শান্তি নিষ্কলুষ ধর্মবিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক খোরাক থেকে আসে। এটা যে মহামন্ত্র যোগান দেয় তা হলো, **'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'**। এই পবিত্র বাক্য প্রচার করার উদ্দেশ্যেই ধরার কোলো মানুষের অবির্ভাবের শুরু থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এঁর আগমন পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছিলেন প্রভুর পক্ষ থেকে।

আল্লাহর রব্বুবিয়াত বা পালনকারিতার উপরই ছিলো এই দীর্ঘ গ্রন্থের আলোচনার বিষয়বস্তু। এ থেকে আশাকরি পাঠকরা অনুধাবন করেছেন, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা একমাত্র ইসলাম ও এর মৌলিক মহাসত্যের চিরন্তন বাণী, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -**'আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নাই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর প্রেরিত রাসূল (বার্তাবাহক)'**-এর মধ্যে নিহিত। মানবসৃষ্ট কোন তন্ত্রমন্ত্র তথা দার্শনিক জ্ঞান ঈমানহীনতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হলে তা মূল্যহীন। মূলত মানুষ জ্ঞানকে সৃষ্টি করে নি বা করতে পারে না। জ্ঞান হচ্ছে প্রভুর সৃষ্ট দান। ঈমান সহকারে জ্ঞানার্জনে অগ্রসর হলেই উপকৃত হওয়া যায়- জ্ঞানবান হওয়া যায়। অথচ বিগত সহস্রাব্দিতে এর বিপরিত ধারায় জ্ঞানার্জনের চেষ্টা চালানো হয়েছে, বিশেষ করে পাশ্চাত্যে। এখন এর ব্যর্থতা উপলব্ধি করা যাচ্ছে। আজ পশ্চিমা জগতই ঈমানহীন জ্ঞানচর্চার অসাড়তা অনুভব করতে পেরে স্বীকার করছে, এক 'মহাপ্রভু' আছেন, যিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, নিয়ন্তা, পালনকর্তা। তাঁকে স্বীকার করে মানবিক উৎকর্ষের চিন্তা করলে সুফল বেরিয়ে আসবে। এটা হবে স্থায়ী সুফল।

বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে মানুষ তারায় তারায় ভ্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে, কিন্তু এ ধরায় আজো নৈতিকতার বিড়ম্বনায় হাহাকার করছে শত শত কোটি মানুষ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যদি আমাদেরকে মহাবিশ্ব ঘুরে দেখার উপায় বের করে দেয়, তাহলে নৈতিকতা, জীবনবোধ, আধ্যাত্মিক খোরাক, সভ্যতা ও সামাজিক সাদৃশ্য কোন জিনিসটি দান করবে? মানবসৃষ্ট দর্শন-জ্ঞান তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে যাবতীয় মানবতৈরী বাদ-মতবাদও। ঐশীসূত্রে আলোকিত মহাসত্য একটি ধর্মবিশ্বাসই হবে এসব মৌলিক চাহিদা মোটাতে সক্ষম। আর এ মহাসত্য ধর্মের নামই হচ্ছে আল-ইসলাম। এ মহাসত্যের ঐশীসূত্র হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। এর প্রাপক ও ব্যাখ্যাতা ছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন, সায়্যিদিল মুরসালীন, খাতামান্নাবিয়্যিন হযরত মুহাম্মাদ আহমাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি ছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, চিন্তাশীল, মানবতার কল্যাণকামী, প্রভুপ্রেরিত রাহমাতে আলম।

পৃথিবীর মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মহান ঐশিগ্রন্থ আল-কুরআন এবং রাহমাতুল্লিল আলামীনের জীবনাদর্শ পুরোপুরিভাবে অনুসরণ ও অনুকরণের মধ্যেই নিহিত।

পরিশিষ্ট-১

ইসলামী স্বর্ণযুগে বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান: ইতিহাসবিদদের মতামত

[**দ্রঃ** আগেকার দিনের পশ্চিমা লেখকরা ‘**আরব**’, ‘**মুহামেডান**’ ইত্যাদি শব্দাবলী ইসলাম, মুসলমান, ইসলামী সভ্যতা প্রভৃতি বুঝাতে লিখতেন। পাঠকরা নিম্নোল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলোতে এরূপ অনেক শব্দাবলী দেখতে পাবেন। এছাড়া আরও কিছু শব্দ আছে যেমন, ‘**সারাসিন**’, ‘**মুরিশ**’, এগুলোও মুসলামানদের বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু উদ্ধৃতি বদলানো যায় না তাই এসব শব্দাবলীর অর্থ সঠিকভাবে বুঝে নিতে হবে।]

বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান ছিলো বিরাট। এ ব্যাপারটি আধুনিককালে আরও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। তবে অতীতে ইউরোপীয় লেখকরা মুসলমানদের অবদানের কথা স্বীকার করতে বেশ কষ্টবোধ করেছেন। ইতিহাস বিকৃতির এসব ব্যাপার-স্যাপার আজ সর্বজনস্বীকৃত। কোন কোন লেখকরা তো এরূপ কার্যকলাপকে নিন্দা করেছেন। এর প্রমাণ আমরা পরবর্তীতে উদ্ধৃত ইউরোপীয় কিছু লেখকের কথার মধ্যেই দেখতে পাবো।

তবে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হচ্ছে, প্রাচ্যের মুসলিম লেখকরা পর্যন্ত ইউরোপীয়দের ঐসব বিকৃত ইতিহাসের উপর আস্থা স্থাপন করে নিয়েছেন এবং মুসলিম স্বর্ণযুগে মুসলমান বিজ্ঞানীদের অবদান সম্পর্কে নীরবতা পালন করছেন। আমাদের পূর্বসুরী মুসলিম জ্ঞানবানদের গৌরবময় অবদান সম্পর্কে জানা থেকে বঞ্চিত থাকাটা তো আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক আত্মঘাতী ব্যাপার। এর মাধ্যমে বিজ্ঞানকে আমরা ‘এলিয়েন’ বা ‘ফরেন’ কিছু বলে মনে করছি- যা মোটেই সত্য নয়।

যা হোক, এই গ্রন্থের অন্যান্য পরিচ্ছেদ ও বিশেষকরে ইউরোপীয় লেখকদের উদ্ধৃতি থেকে এসব ভ্রান্ত ধারণা চিরতরে মুছে যাবে এটাই আশা। আমরা এবার

গৌরবের সঙ্গে বলতে পারবো যে, বিজ্ঞান ইসলাম ও মুসলমানদের স্বর্ণযুগে শতধাপ এগিয়েছিলো, আর মুসলমান হিসেবে সত্যিই আমরা গর্বিত। এছাড়া এটাও স্পষ্ট যে, ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন সংঘাত নেই- কিন্তু এ কথাটি ইহুদী-খস্টবাদের বেলা ভিন্ন। তাদের পাদ্রীরা গ্যালিলিও গ্যালিলাই [১৫৬৪-১৬৪২] এর মতো বিজ্ঞানীকে গৃহবন্দী করেছিলেন। অথচ মুসলিম বিজানীদের অনেকে ছিলেন আল্লাহর ওলি- তথা একদিকে ধার্মিক ও অপরদিকে বিজ্ঞানী। এতে পরিষ্কার হয়েছে যে, বিজ্ঞান ও ইসলামের মধ্যে সামঞ্জস্য ছাড়া আর কিছু নেই।

১.
George Sarton's Tribute to Muslim Scientists in the "Introduction to the History of Science"

"It will suffice here to evoke a few glorious names without contemporary equivalents in the West: Jabir ibn Haiyan, al-Kindi, al-Khwarizmi, al-Fargani, al-Razi, Thabit ibn Qurra, al-Battani, Hunain ibn Ishaq, al-Farabi, Ibrahim ibn Sinan, al-Masudi, al-Tabari, Abul Wafa, 'Ali ibn Abbas, Abul Qasim, Ibn al-Jazzar, al-Biruni, Ibn Sina, Ibn Yunus, al-Kashi, Ibn al-Haitham, 'Ali Ibn 'Isa al-Ghazali, al-zarqab, Omar Khayyam. A magnificent array of names which it would not be difficult to extend. If anyone tells you that the Middle Ages were scientifically sterile, just quote these men to him, all of whom flourished within a short period, 750 to 1100 A.D." [George Sarton, "Introduction to the History of Science", Vol. I-IV," Carnegie Institute of Washington, Baltimore, 1927-31; Williams and Wilkins, Baltimore, 1950-53.]

ভাবার্থঃ মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি স্বরূপ জর্জ সারটন তার ‘ইনট্রডাকশন টু দ্যা হিস্টরী অব সাইন্স’ গ্রন্থে বলেন:
“এ প্রসঙ্গে ক’টি প্রখ্যাত উজ্জ্বল নাম প্রকাশই যথেষ্ট হবে যার তুলনা সমকালীন পাশ্চাত্যে ছিলো না: জাবির ইবনে হাইয়্যান, আল-কিন্দী, আল-খোয়ারিজমী, আল-ফারগানী, আর-রাজী, তাবিত ইবনে কুররা, আল-বাতানী, হুনাইন ইবনে ইসহাক, আল-ফারাবী, ইব্রাহিম ইবনে সিনান, আল-মাসুদী, আত-তাবারী, আবুল ওয়াফা, আলী ইবনে আব্বাস, আবুল কাসিম, ইবনুল যাজ্জার, আল-বিরুনী, ইবনে সিনা, ইবনে ইউনুস, আল-কাসী, ইবনুল হাইসাম, আলী ইবনে ইসা আল-গাযযালী, আল-জারকাবী, উমর খৈয়াম। একটি উজ্জ্বল নামের তালিকা যা সহজে বর্ধিত করা যাবে। যদি কেউ আপনাকে বলে, মধ্যযুগ বৈজ্ঞানিক দিক থেকে নির্জীব ছিলো তাহলে, তাকে এসব নাম বলে দিন। এরা সবই ৭৫০ থেকে ১১০০ সাল- এই অল্প সময়ের মধ্যে কর্মশীল ছিলেন।”

২.
John William Draper in the "Intellectual Development of Europe"

"I have to deplore the systematic manner in which the literature of Europe has continued to put out of sight our obligations to the Muhammadans. Surely they cannot be much longer hidden. Injustice founded on religious rancour and national conceit cannot be perpetuated forever.
The Arab has left his intellectual impress on Europe." [John William Draper, "Intellectual Development of Europe"]

ভাবার্থঃ জন উইলিয়াম ড্রেপার তার “ইন্টেলেকচ্যুয়াল ডেভেলাপমেন্ট অব ইউরোপ” গ্রন্থে বলেন:

"সুপরিকল্পিতভাবে ইউরোপীয় সাহিত্য মুহামেডানদের (মুসলমানদের) প্রতি আমাদের দায়িত্বাবলী যেভাবে উপেক্ষা করে যাচ্ছে তা ঘৃণার চোখে দেখতে আমি বাধ্য। অবশ্যই, এগুলো (মুসলমানদের অবদান) আর লুকিয়ে রাখা যাবে না। ধর্ম ও রাজনীতিক স্বার্থে যেসব অবিচারের জন্ম হয় তা কোন দিনই সর্বকালের জন্য স্থায়ী হয় না।
ইউরোপের উপর আরবরা (মুসলমানরা) তাদের পাণ্ডিত্যের ছাপ রেখে গেছেন।"

৩.

Arnold and Guillaume in "Lagacy of Islam" on Islamic science and medicine.

"Looking back we may say that Islamic medicine and science reflected the light of the Hellenic sun, when its day had fled, and that they shone like a moon, illuminating the darkest night of the European middle Ages; that some bright stars lent their own light, and that moon and stars alike faded at the dawn of a new day - the Renaissance. Since they had their share in the direction and introduction of that great movement, it may reasonably be claimed that they are with us yet." [Thomas Arnold, "The Legacy of Islam," Oxford University Press, 1960.]

ভাবার্থঃ আরনল্ড এবং গিলাইউম তাদের "লেগেসী অব ইসলাম গ্রন্থে" বলেন:
"অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করে আমরা বলতে পারি যে, ইসলামিক মেডিসিন ও বিজ্ঞান হেলেনিক (গ্রিক) সূর্যের আলো ছিলো। দিনের শেষে তা ছিলো চাঁদের আলোর মতো যা ইউরোপীয় মধ্যযুগের সর্বাপেক্ষা অন্ধকার রাতকে আলোকিত করেছিল; কোন কোন উজ্জ্বল তারা নিজস্ব আলো দান করেছে এবং চন্দ্র ও তারাগুলো শেষ পর্যন্ত নব-প্রভাতের আলোতে বিলীয় হয়েছে- অর্থাৎ রেনেসাঁর জন্ম দিয়েছে। যেহেতু এই মহান মুভমেন্টের গতি ও দিকনির্ণয়ে তারাও অংশগ্রহণ

করেছে তাই, এটা দাবী করা যায় যে, তারাও [মুসলামানরা] আমাদের সঙ্গে এখনও আছে।”

৪.

Robert Briffault in the "Making of Humanity"

"It was under the influence of the Arabs and Moorish revival of culture and not in the 15th century, that a real renaissance took place.

Spain, not Italy, was the cradle of the rebirth of Europe. After steadily sinking lower and lower into barbarism, it had reached the darkest depths of ignorance and degradation when cities of the Saracenic world, Baghdad, Cairo, Cordova, and Toledo, were growing centers of civilization and intellectual activity. It was there that the new life arose which was to grow into new phase of human evolution. From the time when the influence of their culture made itself felt, began the stirring of new life. [Robert Briffault, "The Making of Humanity," London, 1938.]

ভাবার্থঃ রবার্ট ব্রিফ তার “মেকিং অব হিউম্যানিটি” গ্রন্থে বলেন:

“আরব ও মুরিস (স্পেনীয়) কালচারেল প্রভাবের ফলেই- যা পঞ্চদশ শতকে ছিলো না- আসল রেনেসাঁ সংঘটিত হয়।

ইতালী নয়, স্পেন ছিলো ইউরোপের নবজন্মের সূত্র। (ইউরোপ) ক্রমাগত নীচের দিকে ধাবিত হয়ে বর্বরতায় পতিত হয়। শেষ পর্যন্ত অজ্ঞতার ভীষণ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে যখন, একই সময় সারাসেনিক বিশ্ব তথা বাগদাদ, কায়রো, কুর্দোভা এবং টলেডো ছিলো পাণ্ডিত্য ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থল। ঐসব স্থানেই নব-

প্রাণের জন্ম নিয়েছিল, যা পরবর্তীতে মানব সভ্যতার বিকাশে নতুন যুগের সৃষ্টি হয়। যখন তাদের কৃষ্টির প্রভাব পড়া শুরু হলো, তখন থেকেই নতুন জীবনের নড়াচড়া ও সূচনা হয়।”

৫.

F.G. Alfalo in "Reguilding the Crescent"
"His (al-Khwarizmi) works in arithmetic and algebra were translated into Latin by the name of Algorithm (which should have been Algorism). His name is the origin of the word Logarithm."

ভাবার্থঃ এফজি আলফালো তার গ্রন্থ “রিগিল্ডিং দ্যা ক্রেসেন্ট”-এ বলেন:
“পাটীগণিত ও বীজগণিতের উপর তার (আল-খোয়ারিজমীর) গবেষণাকে লেটিন ভাষায় তরজমা করা হয় **‘আলগরিথম’** নামানুসারে (যা বাস্তবে হওয়ার কথা ছিলো- আলগরিজম)। তার (আল-খোয়ারিজমীর) নামই হচ্ছে **‘লগেরিথম’** শব্দের সূত্র।”

৬.

Joseph Hell in the "Arab Civilization"

"In the domain of trigonometry, the theory of Sine, Cosine and tangent is an heirloom of the Arabs. The brilliant epochs of Peurbach, of Regiomontanus, of Copernicus, cannot be recalled without reminding us of the fundamental and preparatory labor of the Arab Mathematician (Al-Battani, 858-929 A.D.)."

"The adoption of the sign of 'Zero' (Arabic Sifr or Cipher) was a step of the highest importance, leading up to the so

called arithmetic of positions. With the help of the Arab system of numbers, elementary methods of calculations were perfected; the doctrines of the properties of, and relations between, the equal and the unequal and prime numbers, squares and cubes, were elaborated; Algebra was enriched by the solution of the third degree and fourth degrees, with the help of geometry, and so on. About the year 820 A.D. the mathematician Al-Khawarizmi, wrote a text book of Algebra in examples, and his elementary treatise - translated into Latin - was used by Western scholars down to the sixteenth century." [Joseph Hell, "The Arab Civilization." Tr. Khuda Baksh, Lahore 1943.]

ভাবার্থঃ "আরব সিভিলাইজেশন" নামক গ্রন্থে জসেফ হেল লিখেছেন:
"ট্রিগোনমেট্রির ক্ষেত্রে সাইন, কসাইন ও টানজেন্ট এর থিওরী হচ্ছে আরবদের আবিষ্কার। পিউরবাখ, রিজিওমন্টেনাস, কোপারনিকাসদের মেধাপূর্ণ যুগকে আগেকার দিনের আরব গাণিতিকদের (আল-বাতানী, ৪৫৮-৯২৯ ঈসায়ী) কঠিন সাধনার কথা মনে রাখা ছাড়া স্মরণ করা সম্ভব হবে না।

তিনি আরো বলেন:
"শূণ্যকে (০-কে- আরবীতে সিফ্‌র বা সাইফার বলে) একটি সংকেত দ্বারা উপস্থাপন করার পদক্ষেপ ছিলো সর্বাপেক্ষা গুরুত্ববহ ব্যাপার। এ থেকেই পজিশনের পাটীগণিত এর জন্ম হয়। আরবদের সংখ্যা সিষ্টেমের সাহায্যে মৌলিক অঙ্ককষা সঠিকভাবে আঞ্জাম দেওয়া হয়; সমতা ও অসমতার রূপ, প্রাইম নাম্বার (অবিভাজ্য সংখ্যা), সংখ্যার স্কোয়ার ও কিউব (গুণ ও ত্রি-গুণ), প্রতিষ্ঠিত হয়; তৃতীয় ও চতুর্থ ডিগ্রীবিশিষ্ট বীজগণিতের সমীকরণের সমস্যাবলীর সমাধান বের হয় জ্যামিতির সাহায্যে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ৮৪০ সালে গণিতবিদ আল-খোয়ারিজমী দৃষ্টান্তসহ বীজগণিতের উপর একখানা পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন।

এবং তার সেই মৌলিক গ্রন্থখানা লেটিন ভাষায় ভাষান্তর করা হয়, যা পশ্চিমা গবেষকরা ষষ্টদশ শতাব্দি পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন।”

৭.
Carra de Vaux in the "Legacy of Islam"

"Arithmetic and algebra also flourished alongside of astronomy. This was the period of the cerebrated al-Khwarizmi whose name, corrupted by the Latin writers of the West, gave us, it so believed, the term Algorism (sometimes written Algorithm)." [Carra de Vaux, "Legacy of Islam" and "The Philosophers of Islam."]

ভাবার্থঃ কারা ডি ভো তার প্রখ্যাত “লেগেসী অব ইসলাম” গ্রন্থে বলেন:
“পাটীগণিত এবং বীজগণিতও জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাথে সাথে উন্নত হতে থাকে। এটা ছিলো সুপ্রসিদ্ধ আল-খোয়ারিজমীর যুগ যার নাম লেটিন লেখকরা বদলে দিয়ে আলগোরিজম (কোন কোন সময় লেখা হয় আলগোরিথম) করেন।

৮.
De Lacy O'Leary in "Arabic Thought in History"

"The Greek material received by the Arabs was not simply passed on by them to others who came after. It has a very real life and development in its Arabic surroundings. In astronomy and mathematics, the work of the Greek and Indian scientists was coordinated and there a very real advance was made. The Arabs not only extended what they had received from the Greeks but checked and corrected older records."

ভাবার্থঃ ডি লেসী ওলিয়েরী "আরাবিক থট ইন হিস্টরী" গ্রন্থে মন্তব্য করেন:
"গ্রীস বিষয়াদি আরবদের হাতে এসে সরলভাবে পরবর্তীদের নিকট শুধু পৌঁছে দেওয়াই হয় নি, এগুলো আরব পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বাস্তব জীবনপ্রাপ্ত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতে গ্রীক ও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের গবেষণাকে একত্রিত করে তারা (আরবরা) বাস্তব উন্নয়ন সাধন করেন। আরবরা গ্রীকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিষয়াদিগুলো শুধু বর্ধিত করেননি বরং পরীক্ষা করে পুরাতন রেকর্ডকে সংশোধিত করেছেন।"

পরিশিষ্ট-২

ইতিহাস বিকৃতি ও সত্যকে চাপানোর কয়েকটি দৃষ্টান্ত

এ প্রসঙ্গে আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর উপর ভিত্তি করে পশ্চিমা লেখকদের ইতিহাস বিকৃতি ও সত্যকে চাপানোর বেশ ক'টি দৃষ্টান্ত তুলে ধরবো। এ লেখা পাঠ শেষে ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে অনেকের ধারণা বদলে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। পাঠকরা মনোযোগ সহকারে পাঠ করবেন- এ অনুরোধ করছি।

আমরা অনেকেই এই ধারণা পোষণ করে থাকি যে, বিজ্ঞান মূলত পশ্চিমা চিন্তাবিদদের একক চেষ্টার ফসল। অনেক জ্ঞানকোষে বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে আলোচনায় ঠিক এ কথাটিই ঢালাওভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এসব গ্রন্থাবলী পাঠ করলে সত্যিই মনে হয় অতীতে ও বর্তমানে বিজ্ঞান মূলতঃ ইউরোপ-আমেরিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ একটি জ্ঞানচর্চা। যেমন বিজ্ঞানের ইতিহাসের উপর লেখালেখি বা আলাপচারিতায় আমরা যেসব নাম দেখতে পাই তাদের ক'টি হলোঃ গ্যালিলিও, কোপারনিকাস, কেপলার, বেকন, নিউটন, ডা-ভিনসি, বেনজামিন ফ্রাংকলিন প্রমুখ। যদিও ইতিহাসের শেষের দিকে এসব নাম উল্লেখ করা জরুরী। কিন্তু তাই বলে আগেকার দিনের মুসলিম বিজ্ঞানীদের নাম ও অবদান সম্পর্কে গাফিল থাকার মধ্যে রহস্য কী হতে পারে? এতে তারা এটাই বুঝাতে চান যে, ইউরোপ-আমেরিকা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য প্রসিদ্ধ কালচার থেকে বিজ্ঞানের উপর অবদান ছিলো অত্যল্প! অধিকাংশ লেখায় আমরা ভারতবর্ষ, চীন এবং বিশেষকরে মুসলিম বিজ্ঞানীদের নাম খুব বেশী দেখি না।

পশ্চিমা সভ্যতা যে বিজ্ঞানের উপর মহামূল্যবান অবদান রেখেছে তা আমরা কখনো অস্বীকার করি না। কিন্তু একই অবদান অন্যান্য সভ্যতা থেকেও এসেছে, এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই। বিজ্ঞান মূলত সমগ্র মানবতার অবদান। এজন্য কোন বিশেষ দেশ, জাতি বা সভ্যতাকে এককভাবে গৌরবান্বিত করা

আদৌ ঠিক হবে না। হ্যাঁ- ভারত, চীন, মেসোপটামিয়া, মিশর, গ্রীক, রোম, মুসলিম ইত্যাদি সভ্যতা তাদের স্বর্ণযুগে কালজয়ী অবদান রেখেছে।

পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের বেশ ক'টি আবিষ্কার অনেক আগে মুসলিম বিজ্ঞানীরা করে গেছেন। সুতরাং বিজ্ঞানের মৌলিক অনেক বিষয়াদি যে মুসলমানদের আবিষ্কার তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এবার দেখা যাক পশ্চিমা লেখকরা কিভাবে ইতিহাস বিকৃত করেছেন।

এখানে উল্লেখিত তথ্যাবলীর সূত্র হলো 'ওয়ার্লড বুক ইনসাইক্লোপিডিয়া', 'ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা', 'এনকার্টা ইনসাইক্লোপিডিয়া' এবং আইজাক আসিমভের 'ক্রোনোলজী অব সাইন্স এন্ড ডিসকোভারী'। অন্যান্য তথ্যাবলী এসেছে এই গ্রন্থের প্রমাণপুঞ্জীতে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন বই-পুস্তক থেকে।

১.

মানুষ আকাশপথে ভ্রমণের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে- রজার বেকন [১২২০-১২৯২] উড়ো দেওয়ার একটি যন্ত্র অঙ্কন করেছেন। এছাড়া লিনার্ডো দা-ভিনসি [১৪৫২-১৫১৯] অনেক আগে উড়োজাহাজ বা হেলিকপ্টারের কল্পনা এবং অনেক চিত্রাঙ্কনও করে গেছেন।

তবে এ দু'জনার অনেক আগে ৮০০ সালে আব্বাস ইবনে ফিরনাস [৮১০-৮৮৭ ঈ.] নামক এক স্পেনীয় মুসলিম বিজ্ঞানী একটি উড়োজাহাজ ডিজাইন, তৈরী ও টেস্ট ফ্লাইট করে গেছেন। রজার বেকন ইবনে ফিরনাসের আরবী লেখা থেকে উড়ন্ত মেশিন সম্পর্কে শিক্ষাগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য বেকন ফিরনাসের ৫০০ বছর এবং দা-ভিসনি ৭০০ বছর পর পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। সুতরাং কে সর্বপ্রথম উড়োজাহাজের ধারণার জন্ম দিয়েছিলেন, এ প্রশ্নের জবাবে আমাদেরকে ইবনে ফিরনাসের নাম উল্লেখ করাটাই হবে সঠিক।

২.
কাচের তৈরী আয়না কবে প্রথম নির্মিত হয়েছিল, এর জবাবে বলা হয়- **১২৯১** সালে ইতালির ভেনিস শহরে তা প্রথম তৈরী হয়।

ইসলামী ইতিহাস থেকে জানা যায়, একাদশ শতাব্দিতেই কাচের তৈরী আয়না মসুলিম স্পেনে ব্যবহৃত হয়েছে। ভেনিসের লোকেরা তাদের কাছ থেকেই আয়না তৈরীর পদ্ধতি শিখেছিল। সুতরাং প্রথম কাচের আয়নার আবিষ্কারক ছিলেন মুসলিম স্পেনিশরা- ভেনিসের কেউ নয়।

৩.
ঘড়ি সম্পর্কে বলা হয়েছে- চতুর্দশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র পানি-ঘড়ির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। **১৩৩৫** সালে ইতালির মিলান শহরে একটি বড় আকারের যান্ত্রিক ঘড়ি নির্মিত হয়। এটাই সম্ভবত প্রথম 'ওজন দ্বারা চালিত' ঘড়ি।

স্পেনের মুসলিম ইঞ্জিনিয়াররা একাধিক ধরনের ঘড়ি নির্মাণ করেছিলেন। এগুলো বড় ও ছোট আয়তনের ছিলো। তাদের ঘড়ি তৈরির জ্ঞান পরবর্তীতে লেটিন ভাষায় অনুদিত বই-পুস্তকের মাধ্যমে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এসব ঘড়ি ছিলো ওজন চালিত। ঘড়ির ডিজাইনের মধ্যে গিয়ার ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। একটি ঘড়ির মধ্যে মারকারী বা পারদের ব্যবহার লক্ষণীয়। এটা পঞ্চদশ শতকে ইউরোপীয়ানরা নকল করেছিল। এছাড়া আব্বাস ইবনে ফিরনাস [৮১০-৮৮৭ ঈ.] নবব দশকে একটি ঘড়ি তৈরী করেছিলেন বলে জানা যায়। এটা সঠিক সময় নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। মসুলমানরা অবজারভেটরী বা মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্যও উচ্চমানের এ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ঘড়ি তৈরী করেছিলেন।

৪
বলা হয়েছে- সপ্তদশ দশকে গ্যালিলিও টিনেজ থাকাকালেই সর্বপ্রথম পেন্ডালাম আবিষ্কার করেন। তিনি একটি ঝাড়বাতির গতি লক্ষ্য করার পর বাড়িতে ফিরে পেন্ডালাম তৈরী করেন।

তবে ইতিহাস থেকে জানা যায়, দশম শতকে মুসলিম বিজ্ঞানী ইবনে ইউনুস আল-মিসরী [৯৫০-১০০৯ ঈ.] সর্বপ্রথম পেন্ডালাম আবিষ্কার করেন। তিনি এর গতির উপর গবেষণা করে তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এই গবেষণা পনর শতকে মুসলিম বিজ্ঞানীরা পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় ব্যবহার করেছেন। তাহলে বুঝা গেল, কে পেন্ডালামের আসল আবিষ্কারক।

৫

আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয় যে, গতিশীল টাইপ-মেশিন ও প্রিন্টিং প্রেস পঞ্চদশ শতকে জার্মান বিজ্ঞানী জোহান্স গোথেনবার্গ [১৪০০-১৪৬৮] আবিষ্কার করেন।

বাস্তবে, ১৪১৫ দশকে গোটেনবার্গ যা আবিষ্কার করেছিলেন তা ছিলো মধ্যযুগের সর্বাপেক্ষা উন্নতমানের প্রিন্টিং প্রেস। কিন্তু, প্রিন্টিং প্রেসের আবিষ্কারক তিনি ছিলেন না- কারণ, এর ১০০ বছর আগে মুসলিম স্পেনে গতিশীল টাইপ-মেশিন ও প্রিন্টিং প্রেস ব্যবহৃত হয়েছে বলে সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে।

৬

বলা হয়েছে, আধুনিক অপটিক্স বা আলোকবিজ্ঞানের আবিষ্কারক ছিলেন আইজাক নিউটন [১৬৪২-১৭২৭]। সপ্তদশ শতকে তিনিই সর্বপ্রথম প্রিজম, লেন্স ইত্যাদি ব্যবহার করে আলোকবিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছেন।

কথাটি মোটেই সঠিক নয়! নিউটনের অনেক আগে একাদশ শতকে মুসলিম বিজ্ঞানী আল-হাইসাম [৯৬৫-১০৪০ ঈ.] অপটিক্স সম্পর্কে নিউটন যা করেছেন তার প্রায় সবক'টি তথ্যই আবিষ্কার করে ফেলেন। অপটিক্স বা আলোকবিজ্ঞানের জন্মদাতা যে আল-হাইসাম ছিলেন এখন তা সবাই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু মানেননি ইউরোপীয় স্বার্থবাদী কিছু লেখক ও ইতিহাসবিদ।

নিউটন যে আল-হাইসাম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন সে ব্যাপারে খুব বেশী সন্দেহ নেই। মধ্যযুগে সর্বাপেক্ষা বেশী উদ্ধৃতি যার দেওয়া হতো তিনি ছিলেন আল-হাইসাম।

৭

আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়, সপ্তদশ দশকে আইজাক নিউটন আলোর মধ্যকার সাতটি রং বা স্পেকট্রাম আবিষ্কার করেছিলেন। এ কথাটি অবশ্য আমিও বিজ্ঞানের ইতিহাস খণ্ডে বোধ হয় উল্লেখ করেছি। কিন্তু পরবর্তীতে যা জানতে পারলাম তাতে অবাক হয়েছি।

আসলে আল-হাইসাম ব্যাপারটি পুরোপুরিভাবে আবিষ্কার করেছেন। এর উপর গবেষণায় অপর এক বিজ্ঞানী- যার নাম ছিলো কামাল উদ্দীন, আরও অগ্রসর হন। উল্লেখ্য কামাল উদ্দীন চতুর্দশ শতাব্দিতে জীবিত ছিলেন। স্পেকট্রামের আবিষ্কারক একজন মুসলিম বিজ্ঞানী- এ কথাটি বোধহয় কারো জানা ছিলো না। এখন থেকে আমরা বিষয়টি জেনে সত্যিই আগেকার যুগের এসব মহাত্মনদের কথা স্মরণ করে গৌরবান্বিত বোধ করছি।

৮

শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, বস্তুর মৌলিকত্ব যে অপরিবর্তনীয় তা প্রথম আবিস্কার করেন অষ্টাদশ শতকে লেভোইজিয়ার [১৭৪৩-১৭৯৪] নামক এক বিজ্ঞানী। তিনি লক্ষ্য করেন, বস্তু বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার আয়তন ও আকার বদলায় বটে কিন্তু তার ওজন বা ম্যাস সর্বদাই সমান থাকে। যেমন, পানি তাপের ফলে বাষ্পে পরিণত হওয়া কিংবা লবণ পানিতে গলে যাওয়া অথবা একখণ্ড কাঠ যদি জ্বালিয়ে ছাই করা হয়- এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই বস্তুর ওজন অপরিবর্তন অবস্থায় থাকে।

এই ব্যাপারটির আবিষ্কারক কিন্তু লেভোইজিয়ার মোটেই নন। এই তথ্য নিয়ে অনেক অনেক আগে প্রখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী আবু রাইহান আল-বিরুনী [৯৭৩-১০৪৮ ঈ.] আলোচনা করেছেন। স্বয়ং লেভোইজিয়ার আল-বিরুনীর পুস্তকাদি ও আবিষ্কারের কথা প্রায়ই উল্লেখ করতেন। তিনি বলতেন, আমি তার শিষ্য।

৯
বলা হয়, ট্রিগোনমেট্রি (ত্রিকোণমিতি) নামক গণিত শাস্ত্রের আবিষ্কারক ছিলেন গ্রীকরা। কিন্তু তা কী বাস্তব?

গ্রীসে ট্রিগোনমেট্রি ছিলো থিওরিটিক্যাল বিজ্ঞান। এটা আসলে মুসলিম বিজ্ঞানীদের হাতে এসে উৎকর্ষ লাভ করে। আর এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বেশী গবেষণা করেছিলেন আল-বাতানী [৮৫৮-৯২৯ ঈ.]। এই বিষয়ের মৌলিক শব্দাবলীও আরবী থেকে এসেছে। যেমনঃ- সাইন, কোসাইন এবং টানজেন্ট। সুতরাং ট্রিগোনমেট্রিতে গ্রীকদের মৌলিক অবদান ছিলো অত্যল্প।

১০
বলা হয়ে থাকে- অঙ্ক শাস্ত্রে ডেসিমেল পয়েন্টের ব্যবহার আবিষ্কার করেন ১৫৮৯ সালে ডাচম্যান সাইমন স্টিভেন [১৫৪৮-১৬২০]। তিনিই গাণিতিক ভগ্নাংশকে ডেসিমেল পয়েন্ট দ্বারা লেখার পদ্ধতি দেখিয়েছেন। যেমনঃ- ১/২ কে ০.৫- এভাবে লেখা।

কিন্তু আমরা জানি এই ডেসিমেলের ব্যবহার ইসলামী বিশ্বে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। গিয়াস উদ্দীন আল-কাসী [১৩৯০-১৪৫০ ঈ.] তার গ্রন্থ (অনূদিত নাম) ‘কী টু এরিথম্যাটিকক্স’-এ ডেসিমেলের ব্যবহারের কথা বলেছেন। তিনি স্টিভেনের শতাধিক বছর আগে জীবিত ছিলেন।

১১
বলা হচ্ছে, বীজগণিতে ব্যবহারের জন্য অনেক সংকেত ব্যবহৃত হয়। এগুলোর ব্যবহার সর্বপ্রথম শুরু করেন ফ্রাংকয়েস ভিয়েতা [১৫৪০-১৬০৩] নামক এক গাণিতিক। তিনি ১৫৯১ সালে বীজগণিতের উপর একখানা বই লিখেছিলেন। এতে বীজগণিতের সমীকরণে বর্তমানে সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত x এবং y অক্ষর দেখতে পাওয়া যায়। আইজ্যাক আসিমভ [১৯২০-১৯৯২] বলেন, এটা এতোই

গুরুত্বপূর্ণ ছিলো যে- রোমান নাম্বার সিষ্টেম থেকে আরবী নাম্বার ব্যবহারের সাথে এর তুলনা চলে।

এসব কথা বলেন পশ্চিমা ইতিহাসবিদরা। কিন্তু আসল সত্য কী তাই?

বীজগণিতের আবিষ্কারক মুসলিম বিজ্ঞানীরা। সেই নবম শতকেই সমীকরণের অজানা বস্তুকে অক্ষর ব্যবহারের মাধ্যমে উপস্থাপন তারাই করেছেন। এরই মাধ্যমে তারা বীজগণিতের কঠিন সমীকরণ যেমন, কোয়াড্রেটিক (দু'টি পাওয়ারবিশিষ্ট সমীকরণ) এবং কিউবিক (তিনটি পাওয়ারবিশিষ্ট সমীকরণ) ইত্যাদির সমাধান করেছেন। তারা অবশ্য ইংরেজী বা লেটিন অক্ষর কিংবা x-y-z ব্যবহার করেন নি। এর বদলে ব্যবহার করেছেন আরবী অক্ষর। কিন্তু তাই বলে কিভাবে ইতিহাস বিকৃতিকরণে পারদর্শী ওসব লেখক বলেন, বীজগণিতে অক্ষর ব্যবহার প্রথম করেছিলেন ফ্রাংকয়েস?

১২

অঙ্ক শাস্ত্রের ক্ষেত্রে আরও বলা হয় যে, কঠিন কিউবিক সমীকরণ ষোল শতক পর্যন্ত সমাধানহীন অবস্থায় ছিলো। এরপর নিকোলো টারটাগিলা [১৪৯৯-১৫০০] নামক এক ইতালীয় গাণিতিক তার সমাধান দেন।

কথাটি একেবারেই ভ্রান্ত! ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি- বীজগণিতের তিন পাওয়ার-বিশিষ্ট সমীকরণ (কিউবিক) এর সমাধান মুসলমানরা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এরচেয়ে উচ্চতর ডিগ্রীবিশিষ্ট (চারটি পাওয়ার-বিশিষ্ট সমীকরণ) ইক্যুয়েশনের সমাধান তারা করে গেছেন। আর এসব হয়েছে সেই নবম ও দশম শতকে। উমর খৈয়াম [১০৪৮-১১৩১] এ বিষয়ের উপর বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁর হাতে বীজগণিত বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে।

১৩

অঙ্ক শাস্ত্রের ক্ষেত্রে আমরা আরও দেখতে পাই, ইতিহাসবিদরা বলেন- সংখ্যা যে শূন্যের চেয়ে কম হতে পারে- অর্থাৎ নেগেটিভ নাম্বারের ধারণা ১৫৪৫ সালের

পূর্বে কোথাও জন্মে নি। এ বছর জিরোনিমো কারডানো [১৫০১-১৫৭৬] নামক এক ইতলীয় গাণিতিক এই ধারণার জন্ম দেন।

কিন্তু বাস্তবে এ ধারণার জন্ম হয়েছিল অনেক আগে। প্রায় ৪০০ বছর পূর্বে মুসলিম গাণিতিকরা নেগেটিভ নাম্বারের ব্যবহার করেছেন বলে সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে।

১৪

বলা হয়েছে, ১৬১৪ সালে স্কটিশ গাণিতিক জন নাপিয়ার [১৫৫০-১৬১৭] লগেরিথম নামক গণিতের শাখার আবিষ্কার করেন। তিনি লগ-টেবিলও তৈরী করেছিলেন।

কথাটা খাঁটি নয়! মুসলিম বিজ্ঞানীরা এর অনেক আগে লগেরিথমিক টেবিল তৈরী করেছিলেন। এই তালিকা ত্রয়োদশ শতকে ব্যবহৃত হয়েছে বলে সন্ধান পাওয়া যায়।

১৫

শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, সপ্তদশ দশকে ফরাসী বিজ্ঞানী রেনী ডেসকার্ট [১৫৯৬-১৬৫০] দেখিয়েছেন, বীজগণিত ব্যবহারের মাধ্যমে জ্যামিতি বিষয়ক সমস্যার সমাধান সম্ভব। তিনি যে সিষ্টেম আবিষ্কার করেন তার নাম হলো ‘কারটেসিয়ান সিষ্টেম’। এরই মাধ্যমে তিনি জ্যামিতির উৎকর্ষ সাধন করেন।

কিন্তু এই একই উৎকর্ষ সাধন অনেক আগেই মুসলিম গাণিতিকরা করেছিলেন বলে সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। নবব শতকে ইবনে তাবিত আল-কুররা [৮২৬-৯০১ ঈ.] এবং পরবর্তীতে আবুল ওয়াফা [৯৪০-৯৯৮] কারটেসিয়ান সিষ্টেম ব্যবহার করেছেন। ওয়াফা একটি গ্রন্থে বিষয়টি তুলে ধরেন। অবশ্য সে সময় এর নাম ‘কারটেসিয়ান সিস্টেম’ ছিলো না- এই-যা।

১৬

অঙ্ক শাস্ত্রের ব্যাপারে আরও বলা হয়ে থাকে, আইজাক নিউটন [১৬৪২-১৭২৭] সর্বপ্রথম 'বাইনোমিয়েল থিওরেম' নামক গাণিতিক থিওরী আবিষ্কার করেন। এই থিওরীটি বীজগণিতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ।

অথচ শতাধিক মুসলিম বিজ্ঞানী নিউটনের ৭০০ বছর পূর্বেই বাইনোমিয়েল থিওরেম প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। দশম শতকে বীজগণিতের সমাধান করতে যেয়ে তারা এই থিওরেম ব্যবহার করেছেন।

১৭

বলা হয়, ত্রয়োদশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রহগুলোর গতিবেগ সম্পর্কে গবেষণা তেমন বেশী হয় নি। এরপর স্পেনের আলফোনসো দ্যা ওয়াইজ [১২২১-১২৮৪] নামক এক বাদশাহ-বিজ্ঞানী আলফোনসাইন টেবিল আবিষ্কার করেন যা মিশরের আলেকজান্ড্রিয়ার ক্লোডিয়াস টলেমীর [১০০-১৭০ ঈ.] টেবিল থেকেও নির্ভুল ছিলো।

এ কথাগুলো সম্পূর্ণ সঠিক নয়। টলেমীর আবিষ্কারের উপর মুসলিম বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করেছেন। তারা এসব তথ্যাদি আরও অধিক নির্ভুল করার জন্য ভীষণ চেষ্টা করেছেন। তারাই সর্বপ্রথম গ্রীক বিজ্ঞানীদের ধারণাকে খণ্ডন করে বলেন, সৌরজগতের কেন্দ্র হচ্ছে সূর্য এবং গ্রহগুলো এর চতুর্দিকে ডিম্বাকৃতি (এ্যলিপটিক্যাল) পথে ঘুর্ণমান আছে।

তারা শত শত, অনেকটা নির্ভুল জ্যোতির্বিজ্ঞানের টেবিল তৈরী করেছিলেন। এগুলো তারাসমগ্র ও গ্রহ-উপগ্রহের গতিবিধি কিভাবে হয় তা বুঝাতো। তাদের কিছু কিছু অঙ্ক ও গবেষণা এতোই সঠিক ছিলো যে, এখনও অনেকে মনে করেন এগুলো আজকের যুগের। বাস্তবে আলফোনসাইন টেবিল মুসলিম বিজ্ঞানীদের গবেষণার নকল বৈ কিছু নয়!

১৮

আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, ইংরেজ বিজ্ঞানী রজার বেকন (১২২০-১২৯২) সর্বপ্রথম কাচের তৈরী চশমার ব্যবহারের মাধ্যমে চোখের দৃষ্টি উন্নতর করা সম্ভব বলে উল্লেখ করেন। আর এই একই সময়েই চীন ও ইউরোপে চশমার ব্যবহার শুরু হয়।

এই তথ্যটি সত্যিই ব্রেন-ওয়াস করার প্রয়াস মাত্র! কারণ, ইবনে ফিরনাস [৮১০-৮৮৭] মুসলিম স্পেনে নবব শতকেই চশমা আবিষ্কার করেছিলেন। স্পেনে প্রায় দুই শতাধিক যাবৎ চশমা তৈরী ও বিক্রি হয়েছে। বেকন যদি এ ব্যাপারে কিছু বলে থাকেন তাহলে অবশ্যই তিনি ইবনে হাইতামের কথার পুণরাবৃত্তি করেছেন মাত্র। রজার বেকন প্রায়ই ইবনে হাইতামের গবেষণার কথা উদ্ধৃত করতেন।

১৯

জ্ঞানপুঞ্জিতে লেখা হয়েছে, ১২৪২ সালে রজার বেকনের গবেষণার ফলে ইউরোপে গানপাউডার আবিষ্কৃত হয়। সর্বপ্রথম গানপাউডারের ব্যবহার হয় চীনে। তারা বাঁশের চুঙ্গা দ্বারা বন্দুক বানাতো। মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে তারা এই বন্দুক ব্যবহার করেছে। সালফার ও কয়লা যুক্ত করে তারা গানপাউডার তৈরী করতো।

কিন্তু বাস্তব ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন! চীনারা গানপাউডার ব্যবহার করেছে সত্য। কিন্তু শুধুমাত্র স্ফূলিঙ্গ সৃষ্টিতে। সামরিক ক্ষেত্রে এর ব্যবহার সম্পর্কে তারা ছিলো সম্পূর্ণ গাফিল। সুতরাং এর ফরমুলাও তারা আবিষ্কার করে নি। রেইনোড ও ফেইভ নামক দুজন ইতিহাসবিদ পরিষ্কার দেখিয়েছেন যে, মুসলিম কেমিষ্টরাই সর্বপ্রথম গানপাউডারের ফরমুলা আবিষ্কার করেন। এছাড়া তারা আরও দাবী করেছেন, মুসলমানরাই সর্বপ্রথম আগ্নেয়াস্ত্র তৈরী করেন। বিশেষকরে চতুর্দশ শতকে ইউরোপের আক্রমণ থেকে আলগেরিকাস অঞ্চলের নিরাপত্তায় মুসলিম সৈন্যরা গ্রেনেডের ব্যবহার করেছেন বলে সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে।

জিন মাথিস নামক একজন ইতিহাসবিদের মতে মুসলিম শাসকদের অস্ত্রাগারে রাইফেল, ক্রুড কেনন, সালফারের তৈরী বোমা ও গ্রেনেডের কারখানা ছিলো। অথচ এসব আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার তখনও ইউরোপে শুরুই হয় নি। কেননের ব্যবহার সম্পর্কে সর্বপ্রথম রেকর্ড মেলে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে লিখিত একখণ্ড আরবী পাণ্ডুলিপি থেকে। রজার বেকন গানপাউডারের তথ্যাদি সম্পর্কে লেটিনে ভাষান্তরিত আরবী পুস্তকাদি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেন। সুরতাং এ ক্ষেত্রে তিনি মৌলিক কিছুই আবিষ্কার করেন নি।

২০

আমাদেরকে বলা হচ্ছে, কম্পাসের ব্যবহার সর্বপ্রথম চীনারা করেছিলো। ১০০০ ও ১১০০ সালের মধ্যে মধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রে তারা এর ব্যবহার করে। ইংলিশম্যান আলেকজান্ড্রার নেকাম (১১৫৭-১২১৭) মহাকর্ষ সম্পর্কে কম্পাসের ব্যবহার করেছিলেন। সর্বপ্রথম ব্যবহারের রেকর্ড এটাই।

বাস্তবে মুসলিম ভূগোল বিশেষজ্ঞরা সম্ভবত সর্বপ্রথম চুম্বকীয় সূচ সম্পর্কে চীনাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন। মুসলিম নাবিকরাই সর্বপ্রথম চুম্বকীয় সূচের ব্যবহার শুরু করেন। তারা পরে কম্পাস আবিষ্কার করেন ও এই জ্ঞান পশ্চিমে ছড়িয়ে দেন। বিশেষকরে পৃথিবী অনুসন্ধানের প্রাথমিক যুগে ইউরোপীয় নাবিকরা মুসলিম পাইলট ও তাদের কম্পাসের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। গোল্ডাব লি বন এর মতে, মেগন্যাটিক সূচ ও কম্পাস মুসলমানদের আবিষ্কার। এর সাথে চীনাদের কোন সম্পর্ক নেই। চীনারা ও আলেকজান্ড্রার নেকাম মুসলমানদের কাছ থেকেই হয়তো এ সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন।

২১

আমাদেরকে বলা হয়েছে, ভূগোল বিদ্যাকে পুরাতন যুগের টলেমীর গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলে পঞ্চদশ, ষষ্টদশ ও সপ্তদশ শতকে পুনর্জাগরণ করা হয়েছিল। ক্রুসেড ও স্পেনীয় / ওলন্দাজদের এক্সপিডিশনও এই পুনর্জাগরণের জন্য অনেকটা দায়ী। ভূগোলের উপর সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ইউরোপীয় স্কোলাষ্টিক যুগে লিখিত হয়েছিল।

এই কথাগুলো সম্পূর্ণ বাস্তববিরোধী! আসলে যা বলার কথা তাহলো, মুসলিম ভূগোলবিদরা অসংখ্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি রচনা করেছিলেন। এতে আফ্রিকা, এশিয়া, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদির ম্যাপ তৈরী করা হয়। অষ্টম থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত এই তৎপরতা মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে চালু ছিলো। চতুর্দশ শতকে ইবনে বতুতা [১৩০৪-১৩৬৮/৬৯ ঈ.] পুরাতন বিশ্বের ভুগোলকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। ক্রুডেসের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল- এসাথে এসব সেক্টরে কর্মরত স্কলারদেরকে হত্যা ও গ্রন্থাদী ধ্বংস করা হয়। এর ফলে ভূগোলের ক্ষেত্রে পশ্চিমা জগত তেমন কিছুই পায় নি।

২২
পশ্চিমা ইতিহাসবিদরা বুক ফুলিয়ে বলেন, রবার্ট বয়েল [১৬২৭-১৬৯১] সপ্তদশ দশকে কেমিষ্ট্রি বা রসায়নশাস্ত্রের শুরু করেন।

কিন্তু আসলে একাধিক প্রখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী এই বিদ্যার জন্ম দেন। এরা হচ্ছেন আর-রাজী [৮৫৪-৯২৫ ঈ.], জাবির ইবনে হাইয়ান [৭২১-৮১৫ ঈ.], আল-বিরুনী [৯৭৩-১০৪৮ ঈ.] এবং আল-কিন্দী [৮০১-৮৭৩ ঈ.]। এদের জন্ম হয়েছিল বয়েলের ৭০০ বছর পূর্বে। দুরা নামক একজন ইতিহাসবিদ বলেন, মুসলমানরা এই বিজ্ঞানে পরীক্ষামূলক উপায় সংযুক্ত করেছিলেন। অনেকের মতে মুসলমানরাই হচ্ছেন কেমিস্ট্রি শাস্ত্রের জন্মদাতা।

২৩
বলা হয়, লিনার্দো দা ভিনসি [১৪৫২-১৫১৯] ষষ্ঠদশ শতকে জিওলোজির (ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান) জন্ম দেন। তিনি লক্ষ করেন, পাহাড়ে প্রাপ্ত ফসিল থেকে বুঝা যায় পৃথিবীর সৃষ্টির মৌলিক বস্তু হচ্ছে পানি।

কথাটি বানানো ছাড়া আর কিছুই নয়! কারণ, আল-বিরুনী (১১ শতকে) এই একই জিনিস লক্ষ করেছিলেন। তিনি শুধু বিষয়টি আবিষ্কার করেন নি, এর উপর আরও গভীর গবেষণা চালান। জিওলোজির উপর তার লেখা একটি বিরাট গ্রন্থে

তা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এছাড়া প্রখ্যাত দার্শনিক ও বিজ্ঞানী ইবনে সিনাও [৯৮০-১০৩৭ ঈ.] এ ব্যাপারে অবগত ছিলেন। এটা হয়তো সম্ভব যে, মুসলিম বিজ্ঞানীদের লেখা বই-পুস্তক পাঠ করে দা ভিনসি বিষয়টি জানতে পেরেছিলেন। তার সময়ে অনেক আরবী গ্রন্থাদি লেটিন ভাষায় অনুদিত হয়েছিল। তিনি নিজে এই বিষয়ের উপর কিছুই অতিরিক্ত করেন নি।

২৪

আমাদেরকে বলা হচ্ছে, গ্যালিলিও [১৫৬৪-১৬৪২] (সপ্তদশ শতকে) ছিলেন পৃথিবীর সর্বপ্রথম মহান পরীক্ষক বিজ্ঞানী।

হ্যাঁ, তিনি পরীক্ষা-নীরিক্ষা অনেক করেছেন। তবে সর্বপ্রথম মহান পরীক্ষক তিনি মোটেই নন! কারণ, তার জন্মের শত শত বছর পূর্বে মহান বিজ্ঞানী আল-বিরুনী [৯৭৩-১০৪৮ ঈ.] শত শত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে গেছেন। বাস্তবে তিনিই ছিলেন মহান পরীক্ষক। তার লিখিত দুই শতেরও অধিক গ্রন্থে এসব পরীক্ষার কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। বিজ্ঞানের উপর তার লেখলেখি ১৩,০০০ পৃষ্টার চেয়েও অধিক। গ্যালিলিওর লেখা থেকে তা অনেক বেশী।

২৫

আমাদের বলা হচ্ছে, উপত্যকা কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল- সে ব্যাপারে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন ফরাসী বিজ্ঞানী নিকোলাস ডেসমারেজ [১৬৫০-১৭৪০]। তিনি বলেন, যুগ যুগ ধরে গতিশীল পানির ফোর্স থেকে উপত্যকার সৃষ্টি হয়।

কিন্তু এ ব্যাপারে অনেক আগেই ইবনে সিনা [৯৮০-১০৩৭ ঈ.] ও আল-বিরুনী [৯৭৩-১০৪৮ ঈ.] অনেক কথা বলেছেন। শুধু তাই নয়, তারা উপত্যকা সৃষ্টি কিভাবে হয় তা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

২৬

বলা হয়, চিকিৎসাবিজ্ঞানের শাখা প্যাথোলজির জনক ছিলেন ইতালীর জিওভানী মরগানি [১৬৮২-১৭৭১]। তিনিই নাকি সর্বপ্রথম রোগের স্বরূপ বুঝিয়ে দেন।

এ কথাগুলো সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। কারণ, এটা আজ সর্বজনবিদিত সত্য যে, মুসলিম ডাক্তাররাই ছিলেন প্যাথোলজির জন্মদাতা। তারা রোগের স্বরূপ শুধু বুঝতেন না বরং এ ব্যাপারে অনেক তথ্যবহুল বক্তব্য প্রদান করেছিলেন যা আধুনিক মেডিসিনের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। ইবনে জোহর [১১৬২-১০৯৪ ঈ.] সঠিকভাবে বিভিন্ন রোগের স্বরূপ তুলে ধরেন যেমন- যক্ষ্মা। মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে পানির ব্যাপারে আজ-জাহরাবী [৯৩৬-১০১৩ ঈ.] সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। মানবদেহে রক্তের চলালন নিয়ে বিস্তারিত ও সঠিকভাবে আলেচনা করেন ইবনুল কুফ [১২৩৩-১২৮৬ ঈ.] ও ইবনুন নাফিস্ [১২১৩-১২৮৮ ঈ.]। মুসলিম ডাক্তাররা পেট ও ভাওয়েল এর ক্যান্সার নিয়ে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করেন। সুতরাং প্যাথোলজির জনক জিওভানীকে বানানোর চেষ্টা সত্যিই অদ্ভুত ও যুক্তি-চিন্তার বাইরে।

২৭
আমাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, আধুনিক অ্যানেসথেসিয়া (অজ্ঞান করার পদ্ধতি) উনবিংশ শতকে হামফেরী ডেভী [১৭৭৮-১৮২৯] ও হরেস ওয়েল্স [১৮১৫-১৮৪৮] আবিষ্কার করেছেন।

কিন্তু বাস্তবে তা মোটেই নয়! আধুনিক অ্যানেসথেসিয়ার ব্যবহার মুসলিম ডাক্তাররা আজ থেকে হাজার বছর পূর্বে করে গেছেন। তাহলে এর আবিষ্কারক হামফেরী ডেভী ও হরেস ওয়েল্স হলেন কি করে? মুসলিম সার্জেন্টরা অসংখ্য অপারেশন করেছেন মানুষকে অজ্ঞান করে। অ্যানেসথেসিয়ার ব্যবহার ছাড়া তা কি কখনও সম্ভব ছিলো?

২৮
আরও একটি অবাস্তব তথ্য দেওয়া হয়ে থাকে। তাহলো, সপ্তদশ শতকে ইংরেজ ডাক্তার উইলিয়াম হারভি [১৫৭৮-১৬৫৭] সর্বপ্রথম রক্ত চলাচলের সঠিক তথ্য আবিষ্কার করেন। তিনিই সর্বপ্রথম সনাক্ত করেন, দেহের ভেতর রক্ত চলাচলে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র হচ্ছে হৃদপিণ্ড- যা মূলতঃ একটি পাম্পের মতো কাজ

করে। সুতরাং তাকেই মানবদেহের কার্যকারিতার সঠিক ব্যাখ্যাদাতা বলে প্রচার করা হচ্ছে।

এসব কথা সত্যিই অদ্ভুত! মানবদেহ সম্পর্কে উপরোক্ত কথাগুলো উইলিয়াম হারভি বলে থাকতেও পারেন। এ নিয়ে আমাদের কোন সমস্যা নেই। কিন্তু তিনিই এসব কথা সর্বপ্রথম বলেছেন- এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। এর কারণ হলো, তার জন্মের অনেক অনেক আগে এসব তথ্যাদি মুসলিম বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করে গিয়েছেন।

দশম শতাব্দিতে মুসলিম বিজ্ঞানী আর-রাজী [৮৫৪-৯২৫ ঈ.] এই বিষয়ের উপর বিস্তারিত লিখে গেছেন। এতে তিনি সঠিকভাবে শিরা-উপশিরার কার্যাবলী তুলে ধরেন। হারভির ৩০০ বছর পূর্বে ইবনুন নাফিস্ [১২১৩-১২৮৮ ঈ.] ও ইবনুল কুফ [১২৩৩-১২৮৬ ঈ.] পুরোপুরিভাবে হৃদযন্ত্রের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করে গেছেন। বাস্তবতা হচ্ছে, উইলিয়াম হারভি যখন ইতালির প্রখ্যাত পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন, তখন বেশিরভাগ পাঠ্যপুস্তক ছিলো ইবনে সিনা ও আর-রাজির গ্রন্থাদি। তিনি যে এদের পুস্তকাদি থেকে শেখে উপরোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

২৯

বলা হচ্ছে, কেরোসিন ১৮৫৩ সালে আব্রাহাম গেসনার [১৭৯৭-১৮৬৪] নামক এক ইংরেজ সর্বপ্রথম তৈরী ও উৎপাদন করেন। অ্যাসফাল্ট থেকে তিনি এটা ছেঁকে বের করেন।

কিন্তু আসলে মুসলিম বিজ্ঞানীরা গেসনারের হাজার বছর পূর্বে পেট্রোল থেকে ছেঁকে কেরোসিন তৈরী করেছিলেন। ইতিহাসে থাকা সত্ত্বেও প্রতীচীর লেখকরা তা উপেক্ষা করে নিজেদের নাম-দাম বুলন্দ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এটা সত্যিই দুঃখজনক।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে পাঠকরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন কিভাবে ইউরোপীয় লেখকরা কৌশলে ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা চালিয়েছেন এবং এখনো চালাচ্ছেন। ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু স্বার্থান্বেষী নন-মুসলিম ও বিশেষকরে ইউরোপীয় লেখকদের উপর আমরা কতটুকু আস্থাবান হতে পারি, তা ভাবার বিষয় বৈ কি।

আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগে আমাদের উচিৎ মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্যের উপর গভীর অধ্যয়ন করা। বিশেষ করে আমাদের মহাত্মন পূর্বসুরী বিজ্ঞানীদের জীবন ও কর্মের উপর ব্যাপক তথ্যানুসন্ধান চালিয়ে সঠিক ঐতিহাসিক সত্য সর্বমহলে প্রচার করা একান্ত জরুরী বলে মনে করি। আর এ মহৎ কাজের মাধ্যমেই হিংসাতুর অ-মুসলিম কিছু লেখকের সত্যবিচ্যুত বক্তব্য ও লেখালেখির সমুচিত জবাব দেওয়া হবে। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও জানা হবে মুসলমান হিসাবে আমাদের অতীত গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সঠিক তথ্যাদি। আশাকরি পাঠকরা আমার সাথে একমত হবেন।

পরিশিষ্ট-৩

ইসলামী স্বর্ণযুগের প্রসিদ্ধ কয়েকজন মুসলিম বিজ্ঞানী

ইসলামী ইতিহাস থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শুভাগমণের পর থেকে মানবেতিহাসের চরম রদবদল শুরু হয়। কুরআনে পাক ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ মুতাবিক মুসলিম রাষ্ট্রের সূচনা হয়। ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাসের সঙ্গে মুসলিম বিজ্ঞানীরা সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়ে বিজ্ঞানের চরম উন্নয়নে গবেষণা শুরু করেন। যার ফলে সুদীর্ঘ ৭০০ বছর যাবৎ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। বিজ্ঞানের এরূপ দ্রুত উন্নয়ন ইতোমধ্যে কেউ দেখে নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইসলামী আদর্শ-খিলাফতের পতন ও মুসলিম জাতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ বপন হওয়ার সাথে সাথেই বিজ্ঞানচর্চার চরম ভাটা পড়ে যায়। সেই থেকে পশ্চিমা দেশসমূহে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার নিয়ে চরম নড়াচড়া শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত তারা এগিয়ে যায়। এই অবস্থা এখনও বিদ্যমান আছে। মুসলমানদের অনেকেই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত থেকে যায় আর এই সুযোগে তাদেরই দ্বারা উৎকর্ষিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অন্যরা ব্যবহার করে দ্রুত বৈষয়িক উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়।

এই পরিশিষ্টে আমরা ইসলামী স্বর্ণযুগের ক'জন মুসলিম প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীদের সময়রেখা সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

মুসলিম বিজ্ঞানীদের সময়রেখা

৭২১ খৃঃ- জাবির ইবনে হাইয়্যান (ইউরোপে যাকে গেবের নামে উল্লেখ করা হয়)- তিনিও একজন প্রসিদ্ধ মুসলিম আলকেমিষ্ট বা রাসায়নবিদ ছিলেন। অনেকের মতে এই প্রখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী অত্র শাস্ত্রের অর্থাৎ কেমিস্ট্রির জন্মাদতা। খালিদ ইবনে ইয়াজিদ (মৃঃ ৭০৭ খৃঃ) - আলকেমি বা রসায়ন শাস্ত্রে তিনিও মৌলিক অবদান রাখেন।

৭৪০ খৃঃ- আল-আসমায়ী - তিনি উদ্ভিদবিজ্ঞান এবং প্রাণীবিদ্যার উপর গবেষণা করেন।

৭৮০ খৃঃ- আল-খোয়ারিজমী (ইউরোপে তাকে আলগোরিজম নামে সম্বোধন করা হয়) - তিনি হচ্ছেন প্রখ্যাত গাণিতিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী, অ্যালজেবরা বা বীজগণিতের জনক।

৭৮৭ খৃঃ- জাফর ইবনে মুহাম্মদ আল-বলখী - (ইউরোপে তার নাম হয়েছে, আলবুমাসার) - তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর গবেষণা করে গেছেন।

৭৯৬ খৃঃ (মৃঃ) - ইব্রাহিম ইবনে হাবীব আল-ফজরী - জ্যোতির্বিদ ও অনুবাদক।

৮০০ খৃঃ- ইবনে ইসহাক আল-কিন্দী (ইউরোপে- আলকিন্দাস) - তিনি ছিলেন দার্শনিক, পদার্থবিদ ও আলোকবিজ্ঞানী।

৮০৮ খৃঃ- হুনাইন ইবনে ইসহাক - ঔষধবিদ ও অনুবাদক।

৮১৫ খৃঃ- আবু হানিফা আহমদ ইবনে দাউদ দিনাওয়ারী - ভাষাবিদ ও গাণিতিক।

৮৩৬ খৃঃ- তাবিত ইবনে কুররা (ইউরোপে- তেবিত) - তিনি ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও মেকানিক্স।

৮৩৮ খৃঃ- আলী ইবনে রাব্বান আত-তাবারী - তিনি গণিত ও ঔষধবিজ্ঞানের উপর গবেষণা করেন।

৮৫২ খৃঃ- আবু আব্দুল্লাহ আল-বাতানী (ইউরোপে - আলবাতেঙ্গী) - অঙ্ক শাস্ত্রবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন।

৮৫৭ খৃঃ- ইউহানা ইবনে মাসাওয়ী - চিকিৎসক।

৮৫৮ খৃঃ- আল-বাতানী (ইউরোপে- আলবাতেঙ্গিয়াস) - জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গাণিতিক।

৮৬০ খৃঃ- আল-ফারগানী (ইউরোপে- আলফাগানাস) - তিনি ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

৮৭০ খৃঃ- আল-ফারাবী (ইউরোপে- আলফারাবিয়াস) - বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার উপর তিনি মৌলিক গবেষণা করে গেছেন।

৮৪৮ খৃঃ- আর-রাজী (ইউরোপে- রাজেজ) - মেডিসিন, অপটিক্স ও রসায়ন শাস্ত্রবিদ হিসেবে তিনি সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন।

৯০০ খৃঃ (মৃঃ)- আবু হামিদ আল-আস্তুরলাবী - জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

৯০৩ খৃঃ- আস-সুফী (ইউরোপে- আজফী) - জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

৯০৮ খৃঃ- তাবিত ইবনে কুররা - মেডিসিন ও ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর মৌলিক অবদান রাখেন।

৯১২ (মৃঃ) খৃঃ- মুহাম্মদ ইবনে আমল আত-তামিমী - (ইউরোপে- আতমিমি) - আলকেমিষ্ট।

৯২৩ (মৃঃ) খৃঃ- আল-ফাহাদী ইবনে আহমদ আন-নাইরিজী (ইউরোপে- আলটিবরিজি!) - গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর গভীর গবেষণা করেছেন।

৯৩০ খৃঃ- আহমদ আবু আলী ইবনে মিসকাওয়ী - মেডিসিন ও অস্ত্রোপচার বিশেষজ্ঞ।

৯৩২ খৃঃ- আহমদ আত-তাবারী - মেডিসিন।

৯৩৬ খৃঃ- আবুল কাসিম আজ-জাহরাবী (ইউরোপে- আলবুকাসিস!) - অস্ত্রোপচার ও ঔষধের উপর বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

৯৪০ খৃঃ- মুহাম্মদ আল-বুজ্জানী - অঙ্ক শাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গাণিতিক ছিলেন।

৯৫০ খৃঃ- আবুল কাসিম আল-মাজরেতী - তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত ও কেমিস্ট্রির উপর গবেষণা করেন।

৯৬০ (মৃঃ) খৃঃ- আবু বকর ইবনে ওয়াসিয়া - কেমিস্ট্রি ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের উপর গবেষণা করেন।

৯৬৫ খৃঃ- ইবনে হাইসাম (ইউরোপে- আলহাজেন!) - এই প্রখ্যাত ডাক্তার চিকিৎসাশাস্ত্র, অস্ত্রোপচার, আলোকবিজ্ঞান ও গণিতের উপর গভীর গবেষণা করে গেছেন।

৯৭৩ খৃঃ- আবু রাইহান আল-বিরুনী - প্রখ্যাত এই বিজ্ঞানী গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর মৌলিক গবেষণা করেছেন।

৯৭৬ খৃঃ- ইবনে আবিল আসহাত - তিনি ছিলেন মেডিসিনের উপর বিশেষজ্ঞ ডাক্তার।

৯৮০ খৃঃ- ইবনে সিনা (ইউরোপে- আবিসিনা) - তিনি মেডিসিন, দর্শন ও অঙ্ক শাস্ত্রের উপর মৌলিক গবেষণা করে গেছেন।

৯৮৩ খৃঃ- ইখওয়ানুস সাফা (ইউরোপে- আসাফা) - মুসলিম বিজ্ঞানীদের একটি দলের নাম।

১০১৯ খৃঃ- হাসিব আল-কারজী - গাণিতিক।

১০২৯ খৃঃ- আজ-জারকালী (ইউরোপে- আরজাকেল) - জ্যোতির্বিজ্ঞানী - অ্যাস্ট্রলেব নামক যন্ত্রের আবিষ্কারক।

১০৪৪ খৃঃ- উমর খৈয়াম - তিনি ছিলেন কবি ও গাণিতিক।

১০৬০ (মৃঃ) খৃঃ- আবুল হাসান আলী ইবনে রিদওয়ান - মেডিসিন।

১০৭৭ খৃঃ- আবুল কাসিম ইবনে আবু সাদিয়া - মেডিসিন।

১০৯০ খৃঃ- ইবনে জোহর (ইউরোপে- আভেনজোর) - অস্ত্রোপচার, মেডিসিন।

১০৯৫ খৃঃ- মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে বাজাহ (ইউরোপে- আভেনপেস!) - দর্শন ও মেডিসিন।

১০৯৭ খৃঃ- জিয়াউদ্দীন ইবনে বাইতার (ইউরোপে- বিতার) - উদ্ভিদবিজ্ঞান, মেডিসিন ও ফার্মেকোলজি।

১০৯৯ খৃঃ- আল-ইদ্রিসী (ইউরোপে- ড্রেজেজ!) - তিনি ছিলেন ভৌগোলিক, সর্বপ্রথম পৃথিবীর ম্যাপসহ ভূ-গোলক তৈরী করেন।

১১০০ খৃঃ- ইবনে তুফায়েল আল-কায়েসী - দর্শন, মেডিসিন।

১১২০ (মৃঃ) খৃঃ- হোসাইন ইবনে আলী আল-তুহরায়ী - কবিতা, আলকেমি (রসায়ন)।

১১২৮ খৃঃ- আলী ইবনে রুশদ (ইউরোপে- আভেরস!) - প্রখ্যাত দর্শনিক ও ডাক্তার।

১১৩৫ খৃঃ- মূসা ইবনে মাইমুন (ইউরোপে- মাইমোনাইডিজ) - দর্শন ও মেডিসিন।

১১৪০ খৃঃ- আল-বাদিউল উস্তারলাবী - জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত।

১১৫৫ (মৃঃ) খৃঃ- আব্দুর রহমান আল-কাজিন - জ্যোতির্বিজ্ঞান।

১১৬২ খৃঃ- আব্দুল লতিফ মুয়াফফাক্ব আল-বাগদাদী - মেডিসিন, ভূগোল।

১১৬৫ খৃঃ- আবুল আব্বাস ইবনে রুমাইয়্যা (ইউরোপে- আনাবাতি!) - শিলাবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা।

১১৭৩ খৃঃ- রশীদুদ্দীন আস-সুরী - উদ্ভিদবিজ্ঞান।

১১৮৪ খৃঃ- শিহাবুদ্দীন তিফাসী (ইউরোপে- আত্তিফাসী), শিলাবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা।

১২০১ খৃঃ- নাসিরুদ্দীস তুসী - জ্যোতির্বিজ্ঞান, ইউক্লিডের ধারণাবিরোধী জ্যামিতির প্রতিষ্ঠাতা যা আধুনিক জ্যামিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল।

১২০৩ খৃঃ- মুয়াফ্ফাকুদ্দীন ইবনে উসাইবিয়াহ - মেডিসিন।

১২০৪ (মৃঃ) খৃঃ- আল-বিরতুজী (ইউরোপে- আলপেট্রাগিয়াস!) - জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

১২১৩ খৃঃ- ইবনে নাফিস আল-দামেস্কী - জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

১২৩৬ খৃঃ- কুতুবুদ্দীন সিরাজী - জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল।

১২৪৮ (মৃঃ) খৃঃ- ইবনে বাইতার - ফার্মেসী, উদ্ভিদবিজ্ঞান।

১২৫৮ খৃঃ- ইবনুল বান্না - মেডিসিন, গণিত।

১২৬২ (মৃঃ) খৃঃ- হাসান আল-মুরাকিশী - গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল।

১২৭৩ খৃঃ- আল-ফিদা (ইউরোপে- আব্দুলফিদা) - জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল।

১৩০৬ খৃঃ- ইবনুস সাতির আদ-দামেস্কী - জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত।

১৩২০ (মৃঃ) খৃঃ- কামালুদ্দীন আবুল হাসান আল-ফারসী - জ্যোতির্বিজ্ঞিান, পদার্থবিজ্ঞান।

১৩৪১ (মৃঃ) খৃঃ- মুহাম্মদ ইবনে আদিমির আল-জিলদাকী - রসায়ন।

১৩৫১ খৃঃ- আবু আব্বাস ইবনে তাম্বুগা ইবনুল মাগদী - জ্যোতির্বিজ্ঞিান, গণিত।

১৩৫৯ খৃঃ- শিহাবুদ্দীন ইবনে তাম্বুগা ইবনুল মাগদী - জ্যোতির্বিজ্ঞিান, গণিত।

পরিশিষ্ট-৪

ইংরেজী ভাষায় আরবী শব্দব্যবহারের একটি তালিকা

মধ্যযুগে ইসলামী সভ্যতার ছাপ পশ্চিমা বিশ্বে কতো শক্তিশালী ও সুদূরপ্রসারী ছিলো তা নিম্নোল্লিখিত তালিকা থেকে কিছুটা ধারণা করা যাবে। অনেক বৈজ্ঞানিক শব্দসহ বহু আরবী শব্দ ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় প্রবেশ করে। আমরা এখানে আজও ব্যবহৃত ইংরেজীতে আরবী শব্দব্যবহারের এই তালিকাটি তুলে ধরছি। বলাই বাহুল্য, আমাদের জানা-অজানা আরও বহু ইংরেজী শব্দ আছে যার উৎপত্তি আরবী। কিন্তু কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সংক্ষিপ্তাকারে এ তালিকাটি দেওয়া হয়েছে।

ইংরেজী শব্দ	উচ্চারণ	অর্থ	আরবী শব্দ	শাব্দিক অর্থ
Admiral	এডমিরাল	নৌবাহিনীর প্রধান	আমীরুল বাহর	সাগরের শাসক
Adobe	এডোব	এক ধরনের মাটি	আত-তুবা	ইট
Alchemi	আলকেমী	কেমিষ্টির প্রতিশব্দ	আল-কীমিয়া	বস্তুর কেমিস্ট্রি
Alcohol	আলকোহল	নেশাযুক্ত পানীয়	আল-কহল	নেশাযুক্ত পানীয়
Alcove	আলকোভ	গুপ্ত জায়গা	আল-কুব্বাহ	গম্বুজ, কবর ইত্যাদি
Algebra	অ্যালজেবরা	গণিতশাস্ত্রের শাখা	আল-জবুর	একত্রিকরণ
Algol	আলগল	গউল জাতি	আল-গুল	গউলরা
Algorith	আলগরিথম	কম্পিউটার বিজ্ঞানের লজিক (অঙ্ক)	আল-খোয়ারিজমী	মুসলিম বিজ্ঞানী
Alkaline	আলকালিন	রসায়ন শাস্ত্র	(খোয়ারিজমবাসী)	আল-কালী
Almagest	আলমাজেষ্ট	গ্রীক বিজ্ঞানী টলেমী প্রণিত গ্রন্থের আরবী অনুবাদ	পুড়ানো	আলমাজিস্তি
Almanec	আলমানেক	বাৎসরিক	আল-মানাক	স্পেনে ব্যবহৃত আরবী শব্দ-

				অর্থ অজানা
Antimony	অ্যান্টিমোনি	পঞ্জিকা	আল-ইতমিদ	পদার্থের নাম
Apricot	এপ্রিকট	একজাতীয় ফল	আল-বুরকুক	ফলের নাম
Arsenal	আরসিনেল	অস্ত্রাদি (বা অস্ত্রাগার)	দারুস্‌সানাআহ	তৈরীর-ঘর অর্থাৎ ফেক্টরী
Assassin	এসাসিন	আততায়ী	হাশ্‌শাশিন	গাঁজাখোর
Attar	আত্তার	আতর (সুগন্ধি)	আতর	সুগন্ধি
Azimuth	আজিমাত	রাস্তাসমূহ	আস-সুমুত	রাস্তাসমূহ
Azure	এজিউর	নীলাম্বরী	আল-লাজওয়ারিদ	লাপিজ লাজোরী (ফার্সী থেকে)
Bazar	বাজার	বাজার	বাজাহর (ফার্সী?)	বাজার
Cable	ক্যাবল	তার	হাবল	তার
Canon	ক্যানন	ক্যানন (কামান)	কানুন	আইন
Carat	কার‍্যাট	অল্প-ওজন	কিরাত	ছোট্ট ওজনবিশিষ্ট
Carafe	কারাফ	ছোট্ট গলাবিশিষ্ট পাত্র	গ্বাররাফ	নিমজ্জিত হওয়া
Carmine	কারমিন	রঙ্গিন	কিরমাজা	ক্রিমসন - রং
Cassock	কাছক	একধরনের জামা	খাজাগান্দ	গাঁথা জামা
Checkmate	চেকমেইট	দাবা খেলায় ব্যবহৃত একটি শব্দ	শাহমাউত	(সম্ভবত ফার্সী থেকে) বাদশাহর মৃত্যু
Chemistry	কেমিস্ট্রি	রসায়নশাস্ত্র	আলকেমী	বস্তুর জৈবিক গুণাগুণ
Cipher	সাইফার	শূন্য	সিফ্‌র	শূন্য
Coffee	কফি	কফি	কাহওয়াহ	কফি
Cork	কর্ক	ভাসমান বস্তু	কুরক	ভাসমান জিনিস
Cotton	কটন	সূতা	কুতন	সূতা
Crimson	ক্রিমসন	রং	কিরমাজি	কিরমিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত
Earth	আর্থ	পৃথিবী	আরদ্ব	পৃথিবী
Elixir	এলিক্সার	যাদুর মন্ত্র	আল-ইকসির	দার্শনিকের পরশপাথর
Fakir	ফাকির	ফকির	ফাক্বির	গরীব ব্যক্তি
Garble	গারবল	জগাখিচুড়ী	গ্বারবালা	ছাঁকা

Jinni	জিনি	জ্বিন	জ্বিন	জ্বিন জাতি
Gaul	গউল	দানব - দৈত্য	গুল	খারাপ দানব
Giraffe	জিরাফ	জিরাফ নামক জন্তু	জারাফা	জিরাফ
Harem	হারেম	অন্দরপুরী (বিশেষকরে মুসলিম মহিলাদের কক্ষ)	হারাম	নিষিদ্ধ
Hashish	হাশিশ	গাঁজা	হাশিশ	শুকনো শস্য
Hazard	হাজার্ড	অশনি (ডেনজার)	ইয়াসারা	গুটির খেলা
Jar	জার	পাত্র	জাররা	বড় আয়াতের মাটির তৈরী ফুলদানী
Jasmine	জাসমিন	ফুলের নাম	ইয়াসমিন	একটি ফুলের আরবী নাম
Kismet	কিসমেত	ভাগ্য	ক্বিসমা	অংশ
Lemon	লেমন	লেবু	লাইমুন	আরবী ও ফার্সি ভাষায় লেবুর নাম
Lime	লাইম	একজাতীয় লেবু	লিমাহ	টক ফল
Lute	লিউট	একজাতীয় তারের তৈরী বাদ্যযন্ত্র	আলউদ	কথিত যন্ত্রের আরবী নাম
Magazine	ম্যাগাজিন	ছোট্ট আয়তনের সংবাদপত্র	মাখা-জিন	মূল্যবান দ্রব্যাদি জমা রাখার কক্ষ
Musk	মাস্ক	মুখোশ	মিশ্‌ক	একজাতীয় সুগন্ধি
Mattress	মাট্রিস	শয্যা (বেড)	মাতরাহ (আরবী শব্দ তারাআ নিক্ষেপ করা থেকে এসেছে)	যেখানে কোন কিছু নিক্ষিপ্ত করা হয়
Monsoon	মনসুন	ঋতু	মৌসিম	ঋতু
Mummy	মামী	মিশরের মামী	মুমিয়া	সংরক্ষিত দেহ
Muslin	মাসলিন	মসলিন কাপড়	মউসিল	মুসল শহর
Nadir	নাদির	সর্বনিম্ন	নাদিরাস-সাম্‌ত	জেনিথের (সর্বোচ্চ এর) বিপরিত
Ream	রীম	কাগজের রীম	রিজমাহ	প্যাকেজ (আঁটি)
Rice	রাইস	ভাত- চাউল	রুজ	চাউল
Safari	সাফারী	ভ্রমণে যাওয়া	সাফার	ভ্রমণ

Saracen	সারাসেন	প্রাচ্যের মানুষ	সারক্বিয়্যন	প্রাচের
Satin	সাটিন	সূক্ষ্ম কাপড়	জায়তুনী	জায়তুন শহরে (চীনের একটি শহর)
Scarlet	স্কারলেট	রক্তবর্ণ	সিক্বিলাত	ছবিসহ কাপড়
Sine	সাইন	ট্রিগোনমেট্রির ফাংশন	জায়েব শব্দের বিকৃত অনুবাদ	অঙ্কশাস্ত্রের শব্দ
Sofa	সোফা	বসার চেয়ারসেট	সুফ্‌ফা	উন্নত প্লাটফর্ম যেমন- আসহাবে সুফ্‌ফা
Spinach	স্পিনাচ	শাক	ইসফানাক	শাক
Sugar	শুগার	চিনি	সুক্কার	চিনি
Syrup	সিরাপ	সুমিষ্ট ঘন রস বা তরল পানীয়	শরাব	পানীয়
Tamarind	টামারিন্ড	তেতুঁল	তামর-হিন্দী	ভারতীয় খেজুর
Tariff	টারিফ	কর ইত্যাদির রেট	তাআরিফ	নোটিস দেওয়া
Zenith	জেনিথ	সর্বোচ্চ	সাম্‌ত	রাস্তা
Zero	জিরো	শূন্য	সিফর	খালি বা শূন্য

পরিশিষ্ট - ৫

কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলার পরিচিতি ও বিজ্ঞানসম্পর্কিত আয়াতমালা

পবিত্র কুরআন শরীফে এমক অনেক আয়াত আছে যা আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। আমি নিজে গবেষণা করে এরূপ হাজার খানেকেরও বেশী আয়াতমালার সন্ধান পেয়েছি। এসব আয়াতে অসীম জ্ঞানী আল্লাহ পাক মানুষকে চিন্তা-গবেষণা করার উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে অনেক তথ্যাদি উপমা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

বিভিন্ন বিষয়ে আয়াতমালা দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে স্থান, কাল, গ্রহ-উপগ্রহ, তারাজগত, ভ্রূণবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা এবং অন্যান্য বিষয় আছে। এছাড়া প্রায় আয়াতেই মূল বিষয়ের আগে বা পরে, তারা কি চিন্তা করে না? তারা কি ভাবে না? কিংবা গবেষণা করে না? ইত্যাদি প্রশ্নাবলী দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং কুরআন শরীফ যে মানুষকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য উৎসাহ দান করছে তা স্পষ্ট। আর এ কারণেই অতীতে অসংখ্য মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবির্ভাব ঘটে। সে যুগে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছিলো উপাসনার মতো। কারণ, বিজ্ঞানীরা মনে করতেন তারা কুরআন শরীফের নির্দেশকে মান্য করছেন।

যা হোক, নিম্নে আমরা কুরআন শরীফ থেকে কিছু আয়াতমালা তুলে ধরেছি। পাঠকরা ইচ্ছে করলে প্রতিটি আয়াতে করীম কুরআন শরীফ দেখে পাঠ করে নিতে পারেন। এখানে অবশ্য মূল আরবীসহ এবং বাংলা অনুবাদ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার পরিচিতি সম্পর্কিত আয়াতমালা

১. [সূরা বাক্বারা (২): আয়াত ২৫৫]

اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

-"আল্লাহ (এরূপ যে) তিনি ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই; (তিনি) চিরঞ্জীব, চিরপ্রতিষ্ঠিত, না তন্দ্রা তাঁকে অভিভূত করতে পারে, না নিদ্রা। তাঁরই আয়ত্ত্বাধীন রয়েছে আকাশ ও যমীনসমূহে যা কিছু আছে। এমন ব্যক্তি কে আছে যে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে তাঁর অনুমতি ব্যতীত? দৃষ্টির সামনে কিংবা পেছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।"

২. [সূরা বাক্বারা (২): আয়াত ২৫৬]

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

-"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই বিভ্রান্তি হতে হিদায়াত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন যে কেউ বিভ্রান্তকারীকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর

উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে এমন এক মজবুত শৃংখল আঁকড়ে ধরল যা কখনও ভাঙবার নয়। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন।"

৩. [সূরা ইখলাস (১১২): আয়াত ১-৪]

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ * اللّٰهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

"বলুন, তিনি আল্লাহ এক।"
"আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।"
"তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্মায়নি।"
"এবং তাঁর সমতূল্য কেউ নেই।"

৪. [সূরা হাশর (৫৯): আয়াত ২২-২৪]

هُوَ اللّٰهُ الَّذِى لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ * هُوَ اللّٰهُ الَّذِى لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ * هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

-"তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই; তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞাত; তিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।"
"তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই; যিনি বাদশাহ, পবিত্র, নির্দোষ, ক্ষমাকারী, রক্ষক, পরাক্রান্ত, সংশোধক, মহান; কাফিরগণ কর্তৃক বর্ণিত অংশীদারদের হতে আল্লাহ পবিত্র।"

"তিনি আল্লাহ, স্রষ্টা, নির্মাতা, রূপদাতা, তাঁর বহুসংখ্যক উত্তম-সুন্দর নাম আছে, তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে আসমান ও যমীনের সমুদয় বস্তু; তিনি প্রতাপশালী, সুকৌশলী।"

৫. [সূরা তাগ্বাবুন (৬৪): আয়াত ১৮]

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

-"তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত; পরাক্রান্ত সুকৌশলী।"

৬. [সূরা বনী ইসরাঈল (১৭): আয়াত ১১০-১১১]

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا * وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا

-"বল, তোমারা আল্লাহ ও রহমান নামে ডাকো; যে নামেই ডাকো না কেন তাঁর সকল নামই উত্তম-সুন্দর; নামাজ উচ্চস্বরে পাঠ করো না এবং অধিক ক্ষীণ শব্দেও পড়ো না; বরং উভয়ের মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো।"

"বল, সকল প্রকার প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি না সন্তান রাখেন না কোন তাঁর শরীক আছে বাদশাহীতে এবং না আছে কেহ তাঁর সাহায্যকারী এবং তাঁর গর্ব-তাকবীর করতে থাকো বেশী বেশী।"

৭. [সূরা যুখরুফ (৪৩): আয়াত ৮৪-৮৫]

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ * وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

-"তিনি আকাশেও মা'বুদ এবং পৃথিবীতেও মা'বুদ; এবং তিনিই মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞাত।"
"তিনি মহিমান্বিত- পৃথিবী, মহাকাশ ও এর মধ্যস্থিত সমুদয়ের আধিপত্য একামত্র তাঁরই, তাঁরই নিকট আছে ক্বিয়ামতের জ্ঞান, তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।"

৮. [সূরা আ'রাফ (৭): আয়াত ১৮০-১৮১]

وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

-"আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেই সকল নামেই ডাকবে; যাঁরা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করবে; তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেওয়া হবে।"
"যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা ন্যায়ভাবে পথ দেখায় এবং ন্যায়ভাবে বিচার করে।"

৯. [সূরা নিসা (৪): আয়াত ১৭১]

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

-"হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য-সঠিক কথা ছাড়া বলো না। নিশ্চয়ই মারয়াম তনয় ঈসা মহান আল্লাহর রাসূল ও তাঁর বাণী। যা তিনি মারয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর পক্ষ হতে রূহ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে মেনে নাও। এবং বলো

না, আল্লাহ তিন। এ কথা ত্যাগ করো, তাতে তোমাদের কল্যাণ হবে। আল্লাহ তো একমাত্র মা'বুদ। সন্তান হওয়া তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা তাঁরই। কর্ম বিধায়করূপে আল্লাহ যথেষ্ট।"

১০. [সূরা নূর (২৪): আয়াত ৩৫]

اللّٰهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-"আল্লাহ আসমান-যমীনের নূর (আলো); তাঁর নূরের দৃষ্টান্ত যেমন প্রদীপাধারে এক প্রদীপ; প্রদীপটি এক কাঁচাবরণের মধ্যে রক্ষিত; কাঁচাবরণ এক নক্ষত্র সদৃশ, এটা প্রজ্জ্বলিত হয় পবিত্র জয়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা, যা না প্রাচ্যের, না প্রতিচীর, অগ্নিসংযোগ না করলেও দেখা যাবে তার তৈল সমুজ্জ্বল আলো বিকিরণ করে; নূরের উপর নূর; যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাঁর নূরে পথ দেখান; এবং আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন, আল্লাহ সবকিছু জ্ঞাত।"

১১. [সূরা 'আছর (১০৩): আয়াত ১-৩]

وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

-"কসম যুগের!
"নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে।"
"কিন্তু মু'মিন, নেককার, সৎকর্মশীল এবং পরস্পরকে ন্যায়ের ও পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশদানকারী যারা তারা ছাড়া।"

জগতসৃষ্টি সম্পর্কিত আয়াতমালা

১. [সূরা ফাতিহা (১): আয়াত ১-২]

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

"সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি যাবতীয় জগতসমূহের রব (প্রতিপালক)।"
"অসীম দয়াময়, পরম করুণাময়।"

২. [সূরা আলে ইমরান (৩): আয়াত ৮৩]

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

"তাহলে কি তারা আল্লাহর দ্বীন ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে? অথচ আকাশে ও পৃথিবীতে যা আছে তা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁরই আজ্ঞাধীন এবং তাঁরই দিকে সকলে ফিরে যাবে।"

৩. [সূরা আম্বিয়া (২১): আয়াত ৩০]

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

"যারা কুফরী করে তারা কি দেখে না যে, আসমান ও যমীন ওতপ্রোতভাবে মিশেছিল, তারপর আমি উভয়কে আলাদা করে দিলাম; এবং প্রাণবান সবকিছু আমি সৃষ্টি করলাম পানি থেকে। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?"

৪. [সূরা ফুরক্বান (২৫): আয়াত ৫৯]

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا

"তিনি এমন সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন ছয় দিবসে আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছু, তারপর তিনি সমাসীন হন আরশে। তিনিই পরম দয়াময় রহমান। তাঁর সম্বন্ধে যে খবর রাখে তাকে জিজ্ঞেস করো।"

৫. [সূরা আ'রাফ (৭): আয়াত ৫৪-৫৬]

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ * ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

"নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীন ছয় দিবসে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হন। তিনিই আবৃত করেন রাত্রি দ্বারা দিনকে যাতে তাদের একে অন্যকে দ্রুত গতিতে অনুসরণ করে। তিনিই সৃষ্টি করেছেন চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই আদেশে অনুবর্তী। জেনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ প্রদান করা। আল্লাহ বরকতময়, সারা জাহানের প্রতিপালক।"

"তোমরা ডাক তোমাদের রবকে কাকুতি মিনতি করে এবং গোপনে। তিনি সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না।"

"জমিনে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার পর সেখানে বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না। তাঁকে ডাকো ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত নেককারদের নিকটবর্তী।"

৬. [সূরা হা-মীম সিজ্দাহ (৪১): আয়াত ৯-১২]

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ * وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ

فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ * ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ * فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

"বলুন, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করো, যিনি দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা কি তাঁর জন্য শরীক সাব্যস্ত করো? তিনিই সারা জাহানের প্রতিপালক।"

"তিনি পৃথিবীতে তার উপরিভাগে সুদৃঢ় পর্বতরাজি স্থাপন করেছেন এবং তাতে নিহিত রেখেছেন বরকত। আর চারদিনের মধ্যে তাতে তার অধিবাসীদের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন; যা গণনায় পরিপূর্ণ রয়েছে প্রশ্নকারীদের জন্য।"

"অতঃপর তিনি আসমানের প্রতি মনোনিবেশ করলেন, তখন তা ছিল ধূম্রবৎ। তারপর তিনি তাকে (আসমানকে) ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় আসো। তারা উভয়ে বললো, আমরা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে এলাম।"

"তারপর তিনি আকাশমণ্ডলকে দু'দিনে সাত আসমানে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আসমানে তার জন্য আদেশ প্রেরণ করলেন। আর আমি নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করেছি নক্ষত্ররাজি দিয়ে এবং তাকে হিফাজত করেছি। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।"

৭. [সূরা ত্বালাক্ব (৬৫): আয়াত ১২]

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

"আল্লাহ সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান ও অনুরূপ যমীনও, এসবের মধ্যে নাজিল হয় তাঁর আদেশ; যাতে তোমরা জানতে পারো যে, আল্লাহ

সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং সব কিছুকে আল্লাহ স্বীয় জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।"

৮. [সূরা ইয়া-সীন (৩৬): আয়াত ৩৭-৪০]

وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ * وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ * لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِى لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

"আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন রাত। আমি তার উপর থেকে দিনকে অপসারিত করি। ফলে তৎক্ষণাৎ তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।"

"আর সূর্য স্বীয় গন্তব্যস্থানের দিকে চলতে থাকে। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।"

"আমি চন্দ্রের নির্ধারিত করেছি বিভিন্ন মনযিল, এমনকি তা ভ্রমণশেষে ক্ষীণ হয়ে খেজুরের পুরাতন ডালের মতো হয়ে যায়।"

"সূর্যের সাধ্য নাই যে, সে চন্দ্রকে ধরে ফেলে এবং রাতও দিনের পূর্বে আসতে পারে না; (মহাকাশে) প্রত্যেকেই নির্ধারিত কক্ষপথে সন্তরণ করে।"

৯. [সূরা ফুরক্বান (২৫): আয়াত ৬১-৬২]

تَبَارَكَ الَّذِى جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا * وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

"মহামহিমান্বিত তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন মহাকাশে বিশালকায় গ্রহসমূহ এবং তিনি সেখানে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপী সূর্য ও আলোকময় চন্দ্র।"

"আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাতকে এবং দিনকে পরস্পরের অনুগামীরূপে তাদের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করতে অথবা শোকর করতে চায়।"

১০. [সূরা লুকমান (৩১): আয়াত ১০]

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

"তিন আসমান সৃষ্টি করেছেন স্তম্ভ ব্যতিরেকে, তোমরা তা দেখছ। তিনি পৃথিবীতে সুউচ্চ পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এখানে সব ধরনের জীব-জন্তু দিয়েছেন। আর আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছি, অতঃপর পৃথিবীতে উৎপন্ন করেছি সর্বপ্রকার উত্তম উদ্ভিদ।"

১১. [সূরা জ্বারিয়াত (৫১): আয়াত ৪৭-৪৯]

وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ * وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ * وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ * وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"আর আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আসমানকে সৃষ্টি করেছি এবং আমি অবশ্যই ক্ষমতাশালী।"

"আর আমি যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছি। কত সুন্দরভাবে আমি বিছিয়েছি!"

"প্রত্যেক বস্তু আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার।"

১২. [সূরা নূর (২৪): আয়াত ৪৪]

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ

"আল্লাহ রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটান। নিশ্চয় এতে রয়েছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ।"

১৩. [সূরা রূম (৩০): আয়াত ৮]

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ

"তারা কি নিজেদের মনে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ তো আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যাকিছু আছে তা সবই সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে ও এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য; কিন্তু অনেক মানুষই তাদের রবের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।"

জগতের মধ্যে ব্যালান্স সম্পর্কিত আয়াতমালা

১. [সূরা মুল্‌ক (৬৭): আয়াত ৩-৪]

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ
فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ
إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

"তিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান স্তরে স্তরে। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না। আবার ফেরাও দৃষ্টি, কোন ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় কি?"

"তারপর তুমি বার বার দৃষ্টি ফেরাও, সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে তোমার দিকে।"

"আর আমি তো নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপমালা দিয়ে সুশোভিত করেছি এবং সেগুলোকে করেছি শয়তানের জন্য বিতাড়নের উপকরণ, আর তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি দোযখের আজাব।"

পাহাড় সৃষ্টি সম্পর্কিত আয়াতমালা

১. [সূরা নামল (২৭): আয়াত ৮৮]

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

"আর তুমি পর্বতসমূহকে দেখে অটল-অচল মনে করো অথচ এগুলো সেদিন মেঘরাশির ন্যায় চলমান হবে। এ হল আল্লাহর সৃষ্টি নৈপুণ্য, যিনি সবকিছুকে করেছেন সুষম-সুসংহত। তোমরা যা কিছু করছো তিনি তা সম্যক অবগত আছেন।"

২. [সূরা আম্বিয়া (২১): আয়াত ৩২]

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ

"আর আমি যমীনের উপর সুদৃঢ় পর্বতমালা সৃষ্টি করেছি যাতে তাদেরকে নিয়ে যমীন ঝুঁকে না পড়ে; আমি সেখানে প্রশস্ত রাস্তা [গিরিপথ] সৃষ্টি করেছি যাতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারে।"

৩. [সূরা নাবা (৭৮): আয়াত ৬-৭]

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا * وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا

"আমি কি যমীনকে কিরিনি বিছানা সদৃশ? এবং পাহাড়সমূহকে পেরেক স্বরূপ?"

অণু-পরমাণু সম্পর্কিত আয়াতমালা

১. [সূরা ইউনুস (১০): আয়াত ৬১]

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

"আর তুমি যে অবস্থায়ই থাক এবং সে সম্পর্কে কুরআন থেকে যাকিছু তিলাওয়াত কর, আর তোমরা যে কাজই কর, আমি তোমাদের কছে উপস্থিত থাকি, যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও। আসমান ও যমীনের অণু পরিমাণও তোমার রবের থেকে গোপন থাকে না এবং এর চেয়ে কোন কিছু ক্ষুদ্রতর কিংবা বৃহত্তর নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।"

মানবসৃষ্টি সম্পর্কিত আয়াতমালা

১. [সূরা আ'রাফ (৭): আয়াত ১৮৯]

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

"তিনিই তোমাদেরকে একব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তার [আদমের (আঃ)] স্ত্রী সৃষ্টি করেন যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়। অতঃপর যখন সে তার সাথে সংগত হয় তখন সে এক লঘু গর্ভধারণ করে এবং তা নিয়ে সে অনায়াসে চলাফেরা করে। গর্ভ যখন গুরুভার হয় তখন তারা উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, 'যদি তুমি আমাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দাও, তবে তো আমরা কৃতজ্ঞ থাকবই।"

২. [সূরা বাক্বারা (২): আয়াত ২৮-৩০]

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ * وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"তোমরা কিভাবে আল্লাহর নাফরমানী কর, অথচ তোমরা ছিলে নির্জীব, তারপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করলেন, তারপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তারপর তোমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাবে।"

"তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তারপর আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং তাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করলেন। তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।"

"স্মরণ করুন যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে এক প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।"

৩. [সূরা হিজ্বর (১৫): আয়াত ২৮]

وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِى كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ

“স্মরণ করো, তোমাদের রব্ব যখন ফেরেশতাদের বলেছিলেন, শুষ্ক টনটনে মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করছি।”

৪. [সূরা ফাত্বির (৩৫): আয়াত ১১]

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

“আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি হতে পয়দা করেছেন, এরপর শুক্রকীট হতে, পুনঃ সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে যুগল; আল্লাহর অজ্ঞাতে কোন নারী না গর্ভধারণ করে, না প্রসব করে; কারো আয়ূ বৃদ্ধি বা হ্রাস হলে তাতো হয় সংরক্ষিত কিতাব অনুযায়ী; এটা আল্লাহর জন্য অতি সহজ কাজ।”

৫. [সূরা মু’মিনুন (২৩): আয়াত ১২-১৪]

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

“আর আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে।”
“তারপর তাকে শুক্ররূপে এক সুরক্ষিত স্থানে স্থাপন করি।”
“এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি এমন ‘আলাকে’ যা লেগে থাকে, তারপর সে আলাককে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে, অতঃপর সে মাংসপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করি অস্থি, পরে অস্থিকে ঢেকে দিই গোশত দিয়ে, তারপর তাকে গড়ে তুলি এক নতুন সৃষ্টিরূপে। সুতরাং কত মহান কল্যাণময় আল্লাহ যিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা।”

৬. [সূরা ত্বারিক (৮৬): আয়াত ৫-৮]

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ * إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ

"সুতরাং মানুষের লক্ষ্য করা উচিত কি বস্তু থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"
"তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে নিঃসৃত পানি থেকে।"
"যা বহির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষদেশের মধ্য থেকে।"
"নিশ্চয় আল্লাহ মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে অবশ্যই সক্ষম।"

৭. [সূরা তাগ্বা-বুন (৬৪): আয়াত ৩]

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

"তিনিই সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন যথাযথভাবে এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, আর সুন্দর শোভন করেছেন তোমাদের আকৃতি, আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন।"

৮. [সূরা মু'মিনুন (২৩): আয়াত ৭৮-৮০]

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ * وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

"আর তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন কান, চোখ ও অন্তঃকরণ; তোমরা খুব অল্পই শোকর করে থাক।"
"তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।"
"তিনিই জীবন দান করেন এবং প্রাণ সংহার করেন, আর রাত ও দিনের বিবর্তন তাঁরই ইখতিয়ারে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?"

৯. [সূরা আম্বিয়া (২১): আয়াত ৭]

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"আমি আপনার পূর্বে শুধু মানুষকেই রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি, যাদের প্রতি আমি ওহী পাঠাতাম। যদি তোমাদের জানা না থাকে, তবে যাদের কিতাবের জ্ঞান আছে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও।"

১০. [সূরা আলে ইমরান (৩): আয়াত ৩৩]

قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ * إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

"নিশ্চয় আল্লাহ মনোনিত করেছেন আদমকে, নূহকে, ইব্রাহীমের বংশধরকে এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্ববাসীর জন্য।"

১১. [সূরা ক্বিয়ামাত (৭৫): আয়াত ৩৬-৩৯]

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى * أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى

"মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি বেহিসাবে ছেড়ে দেওয়া হবে?"
"সে কি একবিন্দু শুক্র ছিল না, যা মাতৃগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়েছিল?"
"তারপর তা আলাদা রূপলাভ করে, পরে আল্লাহ তাকে মানুষ আকৃতি দান করেন, অতঃপর সুঠাম করেন।"

১২. [সূরা দাহার (৭৬): আয়াত ১-২]

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا * إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

"অবশ্যই মানুষের উপর কালপ্রবাহে এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিল না।"

"আমি তো মানুষকে মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এ কারণে আমি তাকে করেছি শ্রবণশক্তিসম্পন্ন ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।"

১৩. [সূরা নূহ (৭১): আয়াত ১৪]

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا

"অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে।"

জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি সম্পর্কিত আয়াতমালা

১. [সূরা ইয়া-সীন (৩৬): আয়াত ৩৬]

سُبْحَانَ الَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

"পবিত্র মহান তিনি, যিনি জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেককে।"

২. [সূরা শুরা (৪২): আয়াত ১১-১২]

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ *

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"তিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পাদ জন্তুগুলোরও জোড়া সৃষ্টি করেছেন, এভাবে জোড়া সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোন বস্তুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।"

"আসমান ও যমীনের চাবিকাঠি তাঁরই আয়ত্বে, তিনি যাকে ইচ্ছে প্রচুর জীবিকা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছে সংক্ষীর্ণ করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।"

৩. [সূরা আর-রাহমান (৫৫): আয়াত ৫২-৫৩]

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

"উভয় বাগানে রয়েছে সব ধরনের ফল দুই দুই প্রকার।"

"অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে?"

৪. [সূরা রা'আদ (১৩): আয়াত ৩]

وَهُوَ الَّذِى مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"তিনি বিস্তৃত করেছেন ভূমণ্ডলকে এবং সেখানে সৃষ্টি করেছেন পর্বতমালা ও নদনদী এবং সেখানে প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়, তিনি দিনকে রাত্রি দিয়ে আবৃত করেন। এতে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য।"

৫. [সূরা ক্বিয়ামাহ (৭৫): আয়াত ৩-৪]

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ

"মানুষ কি ধারণা করে যে, আমি হাড়সমূহ একত্র করতে পারবো না?"
"হ্যাঁ, অবশ্যই আমি একত্র করব। কেননা আমি তার অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত যথাযথভাবে ঠিক করে দিতে সক্ষম।"

শিশু ছেলে-মেয়ে হওয়া পিতার উপর নির্ভরশীল সম্পর্কিত

১. [সূরা আন্নাজ্বম (৫৩): আয়াত ৪৫-৪৬]

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ * مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ

"আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন জোড়া নর ও নারী।"
"শুক্রবিন্দু থেকে, যখন তা পরিত্যক্ত করা হয়।"

পানি সম্পর্কিত আয়াতমালা

১. [সূরা নূর (২৪): আয়াত ৪৫]

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"আর আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন; এদের কতক পেটে ভর দিয়ে চলে, কতক দু'পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে। আল্লাহ যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

২. [সূরা রূম (৩০): আয়াত ৪৮]

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

"আল্লাহ্ এমন সত্তা যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর বায়ু মেঘরাশিকে সঞ্চালিত করে; তারপর তিনি মেঘরাশিকে যেমন ইচ্ছে আসমানের শূন্যমণ্ডলের মধ্যে ইতস্তত ছড়িয়ে দেন, এবং কখনও তা খণ্ড-বিখণ্ড করে দেন; অতঃপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে বের হয়ে আসে বৃষ্টিধারা। তিনি যখন তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছে তা পৌঁছে দেন, তখন তারা আনন্দ করতে থাকে।"

৩. [সূরা বাক্বারা (২): আয়াত ২২]

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"তিনি সেই পালনকর্তা যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদস্বরূপ [বায়ুমণ্ডল] করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফল ফসল উৎপাদন করেন। অতএব, তোমরা জেনে বুঝে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করো না।"

৪. [সূরা বাক্বারা (২): আয়াত ১৬৪]

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا

بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে, মানুষের জন্য কল্যাণ সাধনকারী সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে যমীনকে তার মৃত্যুর পর যে পুনরুজ্জীবিত করেন তাতে সব ধরনের জীবজন্তু সেথায় বিস্তার করেন, বায়ুর দিক পরিবর্তনে এবং আসমান ও যমীনের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবান লোকদের জন্য।"

৫. [সূরা কাহফ (১৮): আয়াত ৪৬]

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

"ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা, এবং স্থায়ী নেক কাজ আপনার রবের কাছে সওয়াবের দিক দিয়েও শ্রেয় এবং আশার দিক দিয়েও উৎকৃষ্ট।"

৬. [সূরা মু'মিনুন (২৩): আয়াত ১৮]

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ

"আর আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করি পরিমাণ মত, তারপর আমি তা যমীনে সংরক্ষণ করি। আর আমি তা অপসারিত করতেও অবশ্যই সক্ষম।"

৭. [সূরা ক্বামার (৫৪): আয়াত ১২]

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ

"এবং যমীন থেকে জারি করে দিলাম ফোয়ারাসমূহ; তারপর আসমান ও যমীনের পানি মিলিত হল এক অবধারিত ব্যাপারের জন্য।"

৮. [সূরা মুল্‌ক (৬৭): আয়াত ৩০]

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ

"আপনি বলে দিনঃ তোমরা ভেবে দেখেছ কি- যদি তোমাদের পানি নিম্নদিকে অদৃশ্য হয়ে যায়, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবহমাণ পানি?"

৯. [সূরা ফুরক্বান (২৫): আয়াত ৪৭-৪৮]

وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا * وَهُوَ الَّذِى أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

"আর তিনি তোমাদের জন্য রাতকে করেছেন আবরণস্বরূপ এবং বিশ্রামের জন্য দিয়েছেন নিদ্রা আর দিনকে করেছেন জাগ্রত থাকার সময়।"

"তিনিই স্বীয় রহমতের বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ুকে প্রেরণ করেন এবং আমি আসমান থেকে পবিত্র বিশুদ্ধ পানি বর্ণষ করি।"

১০. [সূরা ফাত্বির (৩৫): আয়াত ১২]

وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"আর সমুদ্র দু'টি সমান নয়- একটি তো মিঠা পানিবিশিষ্ট পিপাসা নিবারণকারী, এর পানি পান করা সহজ, আর অপরটি লবনাক্ত পানিবিশিষ্ট, বিস্বাদ। তোমরা

প্রত্যেকটি থেকেই টাটকা গোশত খাও এবং আহরণ কর মণিমুক্তার অলংকার যা তোমরা পরিধান কর। এবং তুমি দেখতে পাও তার বুক চিরে জাহাজ চলাচল করে যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।”

১১. [সূরা আন’আম (৬): আয়াত ৫৯]

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“তাঁরই কাছে আছে অদৃশ্যের চাবি; তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। তিনি জানেন যাকিছু আছে স্থলে ও জলে। একটি পাতাও ঝরে না তাঁর অজ্ঞাতসারে। কোন শস্যকণা যমীনের অন্ধকারে অঙ্কুরিত হয় না অথবা আদ্র কিংবা শুষ্ক কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্টরূপে কিতাবে নেই।”

১২. [সূরা জ্বাসিয়া (৪৫): আয়াত ৫]

وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“আর রাত ও দিনের পরিবর্তনে, এবং আসমান থেকে আল্লাহ যে পানি বর্ষণ করেন, তারপর তা দিয়ে যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন তাতে, আর বায়ুর পরিবর্তনে, বহু নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবান লোকদের জন্য।”

স্থান ও কাল সম্পর্কিত আয়াতমালা

১. [সূরা হাজ্জ (২২): আয়াত ৪৭]

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ
كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

“আর তারা আপনাকে আজাব তরান্বিত করার জন্য তাগাদা করছে। অথচ আল্লাহ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। নিশ্চয় আপনার রব্বের কাছে একদিন তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান।”

২. [সূরা মা’আরিজ্ব (৭০): আয়াত ৩-৪]

مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ * تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

“যা সংঘটিত হবে আল্লাহর তরফ থেকে, যিনি সোপানসমূহের অধিপতি।”
“ফেরেশতাগণ ও রূহ আল্লাহর সমীপে আরোহণ করে যায় এমন একদিন যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।”

পরিশিষ্ট-৫: স্থান ও কাল সম্পর্কিত আয়াতমালা

৩. [সূরা মু’মিনুন (২৩): আয়াত ১৭]

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ

“আর আমি তো সৃষ্টি করেছি তোমাদের উপর সাতটি কক্ষপথ এবং আমি সৃষ্টি সম্বন্ধে গাফিল নই।”

৪. [সূরা ইয়া-সীন (৩৬): আয়াত ৪১-৪৪]

وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ
مَا يَرْكَبُونَ * وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ (43)
إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ

"আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন এই যে, আমি তাদের সন্তান-সন্ততিকে বোঝাই নৌকায় আরোহণ করিয়েছি।"

"এবং তাদের জন্য আমি এর অনুরূপ সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে।"

"আর আমি ইচ্ছে করলে তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি, তখন কেউ তাদের আর্তনাদে সাড়া দেবে না এবং তারা মুক্তিও পাবে না।"

"কিন্তু আমারই তরফ থেকে রহমত ও কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তা করি না।"

৫. [সূরা আন'আম (৬): আয়াত ১-৬]

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ * هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ * وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ * وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ * فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ * أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ

وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ

"সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং সৃষ্টি করেছেন আঁধার ও আলো। তথাপি কাফিররা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ সাব্যস্ত করে।"

"তিনিই মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর নির্ধারণ করে দিয়েছেন একটি কাল, আর একটি নির্দিষ্ট কাল আছে যা তিনিই জানেন। তথাপি তোমরা সন্দেহ কর।"

"তিনিই আল্লাহ আসমানে এবং যমীনে। তিনি জানেন তোমাদের গোপন ও তোমাদের প্রকাশ্য সবকিছু এবং তোমরা যা অর্জন কর তাও তিনি জানেন।"

"তাদের কাছে আসে নি তাদের রবের নিদর্শনাবলী থেকে কোন নিদর্শন যা থেকে তারা মুখ ফিরায় নি।"

"সুতরাং তারা তো সত্যতে অস্বীকার করেছে যখন তা তাদের কাছে এসেছে। অতএব অচিরেই তাদের কাছে সে বিষয়ের প্রকৃত সংবাদ পৌঁছবে যা নিয়ে তারা উপহাস করত।"

"তারা কি দেখেনি যে, তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠিকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের আমি দুনিয়ায় এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেমন তোমাদেরও করি নি। আর আমি তাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম এবং প্রবাহিত করেছিলাম তাদের নিম্নদেশে নহরসমূহ। তারপর তাদের পাপের দরুন আমি তাদের ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের পরে অন্য মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি।"

৬. [সূরা 'আনকাবুত (২৯): আয়াত ১৯-২২]

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ

وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ * وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

"তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, তারপর তাকে পুনর্বার সৃষ্টি করেন? অবশ্য এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ।"

"বলুন: তোমারা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেছেন। তারপর আল্লাহই সৃষ্টি করবেন শেষবারের সৃষ্টিও। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

"তিনি যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছে অনুগ্রহ করেন, তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।"

"তোমরা তাঁকে যমীনে ও আসমানে অক্ষম করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন হিতাকঙ্ক্ষী নেই, সাহায্যকারীও নেই।"

৭. [সূরা রূম (৩০): আয়াত ৮-৯]

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ * أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

"তারা কি নিজেদের মনে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ তো আসমান, যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তা সবই সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে ও এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য; কিন্তু অনেক মানুষই তাদের রবের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।"

"তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলে দেখতে পেত যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন ভয়াবহ হয়েছিল। তারা শক্তিতে ছিল এদের চেয়ে প্রবল, তারা যমীন চাষ করত এবং তারা যমীনকে আবাদ করেছিল এরা যে পরিমাণ আবাদ

করেছে তার চেয়ে অধিক। তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন। আল্লাহ তো এমন নন যে, তাদের প্রতি জুলুম করতেন, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছিল।"

৮. [সূরা হিজ্বর (১৫): আয়াত ১৬]

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ

"আর নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করেছি আসমানে গ্রহ-নক্ষত্র এবং তাকে সুশোভিত করে দিয়েছি দর্শকদের জন্য।"

৯. [সূরা নাহল (১৬): আয়াত ১২-১৩]

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا
أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

"তিনিই তোমাদের উপকারে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে, সূর্য ও চন্দ্রকে; আর নক্ষত্ররাজি তাঁরই নির্দেশে বশীভূত রয়েছে। নিশ্চয় এতে রয়েছে জ্ঞানবান লোকদের জন্য নিদর্শন।"

"আর বিভিন্ন ধরনের বস্তু যা তোমাদের জন্য তিনি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন (তাও তোমাদের উপকারার্থে নিয়োজিত করেছেন)। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন সেসব লোকের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করে।"

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মহাকাশ ভ্রমণ সম্পর্কিত আয়াতমালা

১. [সূরা আম্বিয়া (২১): আয়াত ৩৩]

وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

"আর তিনি সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।"

২. [সূরা যুমার (৩৯): আয়াত ৫]

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত দিয়ে দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং দিন দিয়ে রাতকে আচ্ছাদিত করেন। তিনি নিয়মাধীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে। প্রত্যেকেই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে। জেনে রেখ, তিনি পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।"

৩. [সূরা আর-রাহমান (৫৫): আয়াত ৩৩]

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

"হে জ্বিন ও মানবজাতি! যদি তোমাদের ক্ষমতা থাকে আসমান ও যমীনের সীমা অতিক্রম করে বের হয়ে যাওয়ার, তবে বের হয়ে যাও; কিন্তু ক্ষমতা ব্যতিরেকে তোমরা বের হতে পারবে না।"

ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কিত আয়াতমালা

১. [সূরা 'আলাক্ব (৯৬): আয়াত ১-২]

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

"পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"
"যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে "আলাক" (জমাট রক্ত) থেকে।"

২. [সূরা হাজ্জ (২২): আয়াত ৫-৬]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِى رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِى الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلٰى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ * ذَلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

"হে মানুষ! তোমরা যদি পুনরুত্থান সম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যে থাক তবে ভেবে দেখ, আমি তো তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্র থেকে, তারপর এমন কিছু থেকে যা লেগে থাকে, তারপর মাংসপিণ্ড থেকে যা পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট হয়ে থাকে, তোমাদের কাছে আমার কুদরত প্রকাশ করার জন্য। আর আমি গর্ভাধারে স্থিত রাখি যা ইচ্ছে করি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুর আকারে মাতৃগর্ভ থেকে বের করি, অতঃপর তোমরা যৌবনে উপনিত হও। আর তোমাদের মধ্যে এমন কতক আছে যারা যৌবনের পূর্বে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কতক এমনও আছে যাদেরকে পৌঁছানো

হয় অকর্মণ্য বয়স পর্যন্ত, ফলে যে বিষয়ে তার জানা ছিল, তা মনে রাখতে পারে না। তুমি যমীনকে দেখতে পাও শুষ্ক, তারপর যখন আমি তাতে পানি বর্ষণ করি তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে আন্দোলিত হয় এবং নানা রকমের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।"

"এসব একারণে যে, আল্লাহ্ই সত্য এবং তিনিই প্রাণহীনকে প্রাণদান করেন আর তিনিই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

৪. [সূরা নাহল (১৬): আয়াত ৬৬]

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ

"নিশ্চয় তোমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয় গৃহপালিত চতুষ্পাদ পশুর মধ্যে। আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্যস্থল থেকে খাঁটি দুগ্ধ যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।"

৫. [সূরা সিজ্বদাহ (৩২): আয়াত ৭-৯]

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ * ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

-"তিনি অতি সুন্দররূপে তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন এবং মানবসৃষ্টি সূচনা করেছেন কাদা মাটি দিয়ে।"

"তারপর তার বংশধরকে সৃষ্টি করেন নগন্য পানির নির্যাস থেকে।"

"অতঃপর তিনি তাকে সুঠাম করেন এবং তাতে নিজের তরফ থেকে রূহ ফুঁকে দেন, আর তোমাদেরকে দান করেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ। কিন্তু তোমরা খুব কমই শোকর কর।"

ফিরাউন ও তার লাশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত আয়াতমালা

১. [সূরা ইউনুস (১০): আয়াত ৯০-৯২]

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ * آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ * فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ

-"আর বনী ইসরাঈলকে নদী পার করিয়ে দিলাম। তারপর তাদের পশ্চাদ অনুসরণ করল ফিরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী নিপীড়ন ও নির্যাতনের উদ্দেশ্যে। এমনকি যখন সে নিমজ্জিত হতে লাগল তখন বলল: 'আমি ঈমান আনলাম, কোন মা'বুদ নেই তিনি ছাড়া, যার প্রতি ঈমান এনেছে বনী ইসরাঈল এবং আমি একজন মুসলিম'।"

"এখন ঈমান এনেছ? অথচ এর পূর্বমুহূর্তেও তুমি নাফরমানী করেছিলে এবং তুমি ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভূক্ত।"

"আজ আমি তোমার (ফিরাউনের) লাশকে রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের বস্তু হয়ে থাক। আর বাস্তবিকপক্ষে অনেক লোক আমার নিদর্শন সম্বন্ধে গাফিল রয়েছে।"

পরিশিষ্ট - ৬

পবিত্র হাদীস শরীফের আলোকে স্বাস্থ্য

বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক ভবিষ্যৎবাণী ও তথ্যাদি প্রকাশ করে গেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এসব ভবিষ্যৎবাণী ইতোমধ্যে বাস্তবে রূপলাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ক'টি প্রসিদ্ধ বাণী হাদীস শরীফ থেকে তুলে ধরছি।

১. বুখারী শরীফের একটি হাদীসে বর্ণিত আছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ পাক পৃথিবীতে এমন কোন রোগ অবতরণ করেন নি যার প্রতিকার বা ঔষধ নেই।"

২. অন্যত্র রোগ সম্পর্কে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন:

كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ

"প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ আছে" [আবু দাউদ ও মুসলিম শরীফ]।

৩. আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগের চিকিৎসার উৎসাহ প্রদান করে বলেন:

يَا عِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُوَ قَالَ الْهَرَمُ

"হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমারা রোগের চিকিৎসা করো। আল্লাহ্ এমন কোন রোগ দেন নি, যার ঔষধও তিনি দেন নি, কেবলমাত্র একটি রোগ ছাড়া। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ রোগটি কি? জবাব দিলেন, বার্ধক্য" [তিরমিযী, ইবনে মাযাহ]।

৪. মহামারী থেকে বাঁচার জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে বলেন:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

"তোমরা যদি শুনতে পাও যে, কোথাও মহামারী রোগের প্রকোপ দেখা দিয়েছে তাহলে তাতে গিয়ে প্রবেশ করো না; আর তোমরা যেখানে থাকো সেখানে যদি সংক্রামক রোগ হানা দেয়, তাহলে সেখান থেকে পলায়নপর হবে না।" [বুখারী, মুসলিম শরীফ]।

আজকাল কোথাও মহামারী দেখা দিলে আক্রান্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদেরকে 'কুয়ারেন্টিন' অবস্থায় রাখা হয়। উক্ত হাদীস শরীফেও এই একই উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

৫. পবিত্রতার ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসংখ্য বাণী রেখে গেছেন। পবিত্রতা আল্লাহ পাক পছন্দ করেন। এছাড়া পবিত্রতা হচ্ছে স্বাস্থ্যের জন্য জরুরী। মুসলিম শরীফে একটি হাদীসে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ

"যদি কোন কুকুর তোমাদের খাবার পাত্রে মুখ লাগিয়ে থাকে (জিহ্বা দ্বারা চটে থাকে) তাহলে এ পাত্রটিকে সাতবার ধুয়ে ফেলবে। প্রথমবারে মাটি ও বাকী ৬ বার পানি দ্বারা" [মুসলিম শরীফ]।

৬. পবিত্রতা সম্পর্কে অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন:

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

"ঘুম থেকে জেগে উঠে তোমরা হাত ধুয়ে নেবে কারণ, ঘুমন্ত অবস্থায় তা কোথায় ছিলো, তোমরা জানতে না" [মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী শরীফ]।

আধুনিক যুগের ডাক্তররা বলেন, অধিকাংশ রোগের উৎপত্তি অপরিষ্কার হাত থেকে হয়ে থাকে। এ কথাটি উক্ত হাদীস শরীফের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।

৭. রোগজীবাণু সম্পর্কে মানুষ আধুনিক যুগে অবগত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এব্যাপারে অনেক আগেই আমাদেরকে সতর্ক করে গেছেন:

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ

"আমার উম্মতের জন্য যদি কঠিন বলে মনে হতো না, তাহলে প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে মিসওয়াক দ্বারা দন্ত পরিষ্কার করা ফরজ করে দিতাম" [বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ শরীফ]।

উল্লেখ্য দাঁতের মাড়িতে খাবার পরে রোগজীবাণূ থেকে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। মিসওয়াক দ্বারা ভালো করে পরিষ্কার করে নিলে রোগজীবাণূ থেকে মুক্ত থাকা সহজ। দাঁত মাঝার ব্যাপারটি ইউরোপে অনেক পরে প্রচলিত

হয়েছিল। এখন দন্ত ডাক্তাররা দাঁত মাঝার গুরুত্ব সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করে থাকেন।

৮. খাদ্য ও পরিপাক সম্পর্কে এখনও বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করে যাচ্ছেন। অতিরিক্ত খাদ্য যে শরীরের জন্য ক্ষতিকর তা আজকালকার ডাক্তাররা বলছেন। কিন্তু এর সঠিক দিক-নির্দেশনা আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে পেয়েছি। তিনি ইরশাদ করেন:

“তোমরা পেটের এক তৃতীয়াংশ খাদ্য, অপর অংশ পানি দ্বারা ভর্তি করবে। বাকী অংশটুকু খালি রাখবে। পরিপূর্ণ পেট আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়” [তিরমিযী শরীফ]।

৯. অতিরিক্ত খাদ্য ভক্ষণ, বেশী নিদ্রা, অলসতা ইত্যাদি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করতেন না। একটি হাদীস শরীফে আছে:

أخشى ما خشيت على أمتي كبر البطن ◉ ومداومة النوم الكسل وضعف اليقين

“আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে যা ভয় করি তাহলো অতিরিক্ত খাবার, বেশী নিদ্রা, অলসতা ও অনিশ্চয়তাবোধ” [কানযুল উম্মাল, ৩; পৃঃ ৪৬০]।

১০. চোখের প্রতি খেয়াল রাখার জন্য তিনি তাগিদ দিয়েছেন এভাবে:

اكْتَحِلُوا بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ

“তোমাদের চোখে সুরমা ব্যবহার করবে কারণ, সুরমা দৃষ্টি প্রখর করে ও চোখের পাতার জন্য উপকারী” [আবু দাউদ, তিরমিযী শরীফ]।

১১. কালিজিরার উপকার সম্পর্কে একটি হাদীসে আছে:

فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونِيزُ

"এই কালো বিচির মধ্যে [কালিজিরায়] আছে মৃত্যু ছাড়া সবধরনের রোগের ঔষধ" [বুখারী শরীফ]।

১২. একদা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিলেন:

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ

"মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হলো ৫টি। খতনা হচ্ছে এর একটি" [মুসলিম, আবু দাউদ শরীফ]।

আজকের বিজ্ঞানীরা একমত হয়েছেন যে, পুরুষাঙ্গের মাথার চামড়াটুকুতে রোগজীবাণু বাস করে ও এ থেকে ক্যান্সার পর্যন্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। তাই মুসলিম, অমুসলিম সকলেই সমগ্র বিশ্বব্যাপী খতনার প্রচলন শুরু করেছেন।

১৩. মাছির মধ্যে রোগজীবাণু থাকার ব্যাপারটি আজকাল সর্বজনবিদিত সত্য। কিন্তু এ সত্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু জানতেন না, এর প্রতিকারের কথাও তিনি বলে গেছেন:

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُخْرَى شِفَاءً

"তোমাদের পানপাত্রে যদি মাছি পড়ে যায় তাহলে তাকে (মাছিকে) বের করে ফেলার আগে সম্পূর্ণরূপে পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে দেবে। কারণ, মাছির এক পাখায় থাকে রোগ আর অপরটিতে এর নিরাময়" [বুখারী শরীফ]।

এখানে উল্লেখ্য যে, মাছির ব্যাপারে কিছু তথ্য অতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে যা উপরোক্ত বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যায়। মাছি যখন কোন পাত্রে পতিত হয় তখন সে একটি পাখা খাবার থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে। এর কারণ হলো আবার উড়ে যেতে তার বেশ সুবিধা হয়। সুতরাং যে পাখায় সে রোগজীবাণু নিয়ে আসে তা খাবারের মধ্যে রেখে নির্বিঘ্নে চলে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু যখন তার অপর পাখাও খাবারের মধ্যে ডুবে যাবে তখন এতে রক্ষিত জীবাণুনাশক উপাদানের ছোট্ট ব্যাগটি খুলে গিয়ে সকল রোগজীবাণুকে ধ্বংস করে দেয়। এটা মেডিসিনের একটি অত্যাধুনিক আবিষ্কার।

১৪. উম্মুল মুমিনীন হযরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছেঃ

جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي قَالَ وَقَالَ أَبِي ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ

"একদা হযরত আবু হুবায়েশ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর মেয়ে ফাতিমা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার রক্তঝরা বন্ধ হচ্ছে না; আমি কি ফরজ নামাজ পড়া থেকে বিরত থাকবো? তিনি জবাব দিলেনঃ না অবশ্যই নয়, কারণ এটা তোমার হায়েজের (পিরিয়োডের) রক্ত নয়। এটা হচ্ছে যখমের রক্ত" [বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ শরীফ]।

এখানে উল্লেখ্য যে, সে যুগে এটা জানা ছিলো না কোন্‌টি হায়েজ আর কোন্‌টি যখমের রক্ত।

১৫. হযরত তারিক ইবনে সুয়াইদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে একটি বর্ণনায় আছে:

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشْرَبُ مِنْهَا قَالَ لَا فَرَاجَعْتُهُ قُلْتُ إِنَّا نَسْتَشْفِي بِهِ لِلْمَرِيضِ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ

"তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানতে চাইলাম, আমরা আঙ্গুরের রস বের করে মদ বানিয়ে তা পান করি। তিনি জবান দিলেন, না পান করো না। আমি বললাম, এটি অসুস্থ ব্যক্তির জন্য শিফা। তিনি বললেন, না শিফা হতে পারে না। বাস্তবে এটাই হচ্ছে একটি রোগ" [মুসলিম, ইবনে মাযাহ শরীফ]।

উল্লেখ্য, বিজ্ঞানীরা এব্যাপারে একমত: মদ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর।

সহায়ক গ্রন্থাদি / References

1. Ben David, Joseph, The Scientist's Role in Society, 2d ed. (1984)
2. Brush, Stephen G., The History of Modern Science (1987)
3. Cohen, Morris R., Reason and Nature: An Essay on the Meaning of Scientific Method (1931; repr. 1985)
4. Serton, G., Introduction to the History of Science (1982)
5. Harre, R., The Philosophies of Science (1972)
6. Kuhn, Thomas S., The Structure of Scientific Revolutions, 2d ed. (1970)
7. Latakos, Imre, and Musgrave, A., Criticism and the Growth of Knowledge (1970)
8. Lindberg, David, ed., Science in the Middle Ages (1978) and The Beginnings of Western Science (1992)
9. Lindberg, David, and Numbers, Ron, eds., God and Nature (1986)
10. Lloyd, G. E. R., Early Greek Science (1970)
11. Mason, Stephen F., A History of the Sciences (1962)
12. Nasr, Sayyed H., Science and Civilization in Islam (1968)
13. Needham, Joseph, Science and Civilization in Islam, 6 vols. to date (1954-86)
14. Neugebauer, Otto, The Exact Sciences in Antiquity (1957)

15. Porter, Roy, ed., Man Masters Nature (1989)
16. Richards, Stewart, Philosophy and Sociology of Science (1984)
17. Sambursky, Samuel, Physical Thought from the Pre-Socratics to the Quantum Physicists (1975)
18. Chalmers, Alan, What is This Thing Called Science? (1985)
19. Dahlstrom, D. O., ed., Nature and Scientific Method (1990)
20. Goodlad, J. S., Science for Non-Scientists (1983)
21. Landau, Larry, Science and Relativism (1990)
22. Morris, Richard, Dismantling the Universe (1983)
23. Morrison, Philip and Phyllis, The Ring of Truth (1987)
24. Crease, R.P., and Mann, C.C., The Second Creation: Makers of the Revolution in Twentieth-Century Physics (1986)
25. Snow, C.P., The Physicists (1981)
26. Einstein, Albert, and Infeld, Leopold, The Evolution of Physics (1961)
27. Heilbron, J. L., Elements of Early Modern Physics (1982)
28. Kevles, Daniel J., The Physicists: The History of a Scientific Community in Modern America (1978; repr. 1989)
29. Motz, L., and Weaver, J., The Story of Physics (1989)
30. Pais, A., Inward Bound: Of Matters and Forces in the Physical World (1987)
31. Park, D., The How and the Why (1988)

32. Weiner, C., ed., History of Twentieth Century Physics (1977)
33. Mader, Sylvia, Human Biology (1987)
34. Powis, R. L., The Human Body and Why It Works (1985)
35. Beyer, Robert, ed., Foundations of Nuclear Physics (1949)
36. Feinberg, Gerald, What is the World Made Of? (1977)
37. Lapp, Ralph, and Andrews, Howard, Nuclear Radiation Physics (1972)
38. Van Melsen, Andrew, From Atomos to Atom (1952)
39. Duffin, W.J., Electricity and Magnetism, 3d ed. (1989)
40. Mulvey, J.H., ed., The Nature of Matter: Wolfson College Lectures, 1980 (1981)
41. Alekseev, G. N., Energy and Entropy (1986);
42. Challoner, Jack, Energy (1993)
43. Lapedes, Daniel L., ed., McGraw-Hill Encyclopedia of Energy (1976)
44. Youmans, Edward L., The Correlation and Conservation of Forces (1981)
45. Bergmann, P. G., The Riddle of Gravitation (1968)
46. Hawking, S. W., and Israel, W., Three Hundred Years of Gravitation (1987, repr. 1989)
47. Hawking, S. W., A Brief History of Time (1999)
48. Mathews, P. M., et al., eds., Gravitation, Quantum Fields and Superstrings (1988)

49. National Research Council, Gravitation, Cosmology, and Cosmic-Ray Physics (1986)
50. Thorne, K. S., Gravitational Radiation (1989)
51. Asimov, Isaac, Asimov's New Guide To Science (1987)
52. Lezende, Lisa, Ph.d., Chronology of Science (2007)
53. Hitti, Philip K., History of the Arabs (2002 Ed.)
54. Russell, Betrand, History of Western Philosophy (1995 Ed.)
55. Chambers Dictionary of World History (1994 Ed.)
56. The Bible, the Quran and Science- Dr Maurice Bucaille; Seghers (1993 edition).
57. Encyclopedia of Science (CD)- Dorling Kindersley Multimedia
58. Redshift (CD)- Maris Multimedia
59. Grolier Multimedia Encyclopedia (CD)
60. Encyclopedia Britannica
61. The Internet
62. MS Encarta Premium Encyclopedia
৬৩. তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন; আল্লামা শফী (রহঃ); অনুবাদ- মাওলানা মুহিউদ্দীন খান; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
৬৪. তাফসীরে আশরাফী; এমদাদিয়া লাইব্রেরী।
৬৩. এহইয়াউ উলূমিদ্দীন; ইমাম গাযযালী (রহঃ); অনুবাদ; এ এন এম ইমদাদুল্লাহ; বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী।
৬৪. হিকায়াত-ই-সাহাবা, মুহাম্মদ জাকারিয়া কান্ধালভী (রহঃ); বাংলা অনুবাদ- আব্দুর রশীদ আরশাদ; তাজ কোম্পানী।

৬৫. ইমাম গাজ্জালীর জীবন ও দর্শন, আল্লামা শিবলী নোমানী; বাংলা অনুবাদ- কাউছার বিন খালেদ; কোহিনূর লাইব্রেরী।
৬৬. সত্যের সন্ধানে- ইমাম গায্যালী (র); অনুবাদ- মাওলানা মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন; ছারছীনা লাইব্রেরী।
৬৭. তাফসীরে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) [প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড], হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা); অনুবাদ- অনুবাদকমণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
৬৮. কুরআন শরীফ বঙ্গানুবাদ- ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান; খোশরোজ কিতাব মহল।
৬৯. সিরাত বিশ্বকোষ; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
৭০. মিশকাত শরীফ।
৭১. আল-মাকতাবাতুশ্ শামিলা (ইলেকট্রনিক্স লাইব্রেরী)।
৭২. বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান বিশ্বকোষ।